২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ☐ ২১ তম সংখ্যা

১৫ মে, ২০০৩ ঈসাব্দ

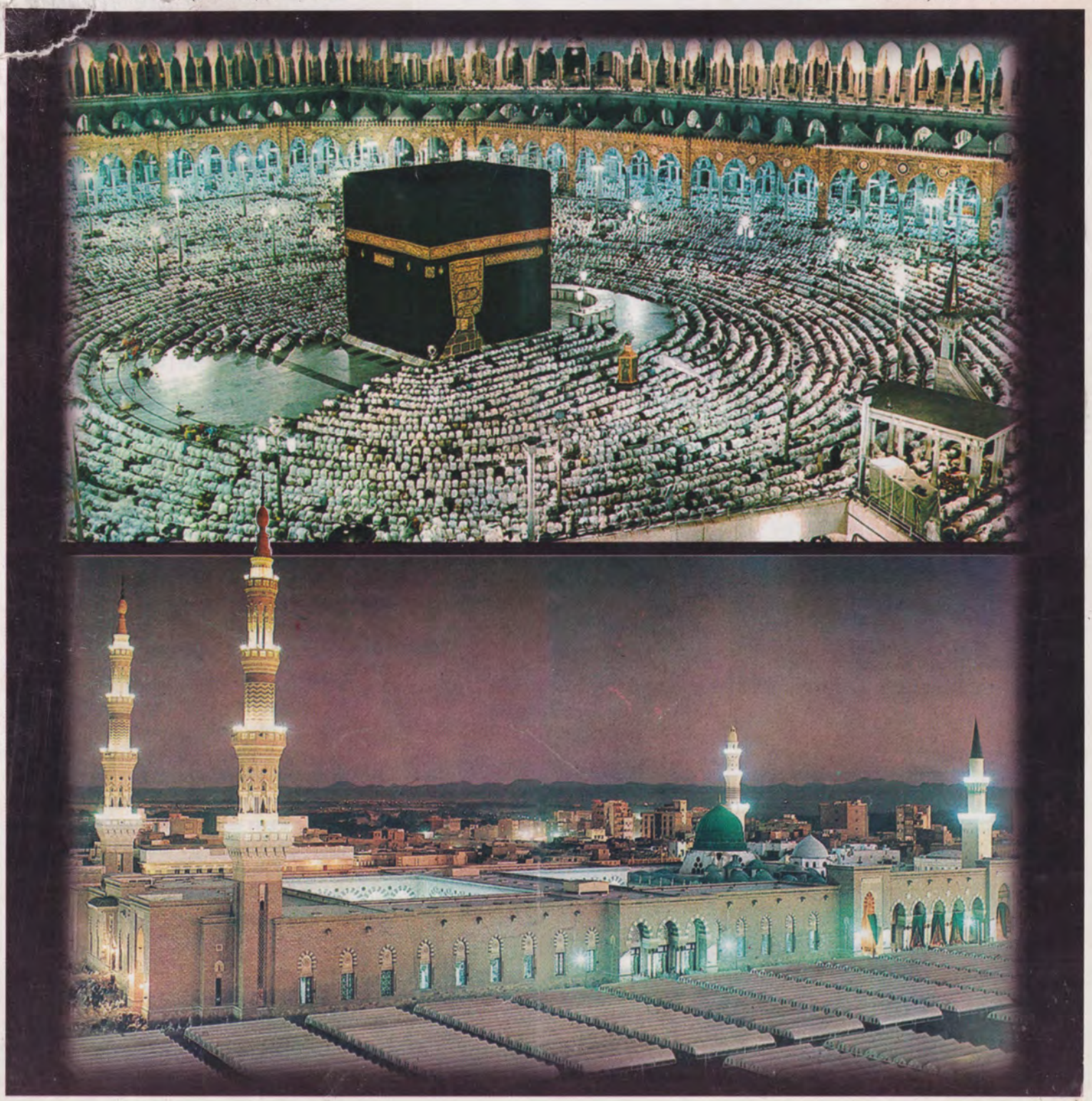

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

MTA সম্প্রচারিত খুতবা শুনছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সহ জামাতের সদস্যবৃন্দ (৯-৫-০৩)

রাজশাহীতে নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ আলহাজ্জ ড. তারেক সাইফুল ইসলাম সাহেবের সাথে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও তাঁর সফরসঙ্গী জনাব ইব্রায়েতুল হাসান

ভাতগাঁও জামাতের হালকা মসজিদের ভিত্তি রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব

হাশের আহমদ মুবাশ্বের রুদ্র, ওয়াকফেনও নং -৬৪২০বি, পিতা- মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের, মোয়াল্লেম, মাতা- ফেরদৌসী মুবাশ্বের রত্না, দাদা- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, নানা- মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

ওসীয়্যত একটি ঐশী ব্যবস্থা

ওসীয়্যত মানে উইল। যারা ওসীয়্যত করেন তারা মুসী। যেসব আহমদী এমন ঈমান এনেছে 'যাতে কোন পার্থিব (স্বার্থ ও লালসার) সংমিশ্রণ নেই আর যে ঈমান কপটতা, মিথ্যা, ভীরুতাদুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর 'বিবর্জিত নয়' এরূপ আহমদীরা খোদার প্রিয় ব্যক্তি' 'তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা' (আল্ ওসীয়্যত)। এসব আহমদী তাদের আয়ের এবং মৃত্যুর পর তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে কমপক্ষে এক দশমাংশ ও বেশির পক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নামে ওসীয়্যত বা উইল করে দিলে তারাই হবেন মুসী।

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম একটি কবরস্থান তৈরী করেন। এর নাম বেহেশ্‌তি মকবেরা। এটা হবে জামাতের সেসব মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধি ক্ষেত্র যারা ওসীয়্যত করেছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা জানিয়েছিলেন বেহেশ্‌তি লোকেরা এখানে সমাহিত হবেন।

কবরের মাটি কাউকে বেহেশতি করবে না। 'জামাতের সেসব পবিত্র আত্মা ব্যক্তিগণের এটা হবে নিদ্রাস্থান যারা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন আর সংসার-প্রেম পরিহার করেছেন এবং খোদার হয়ে গিয়েছেন। নিজেদের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ প্রসঙ্গে অনেক দোয়া করেছেন যেন উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকদের এটা সমাধি ক্ষেত্র হয় যারা আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশ্‌তী'।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে লিখেছেন, "ইহা খোদাতাআলার কাজ। খোদাতাআলার কাজে তিনি যা চান তা-ই করেন। নিঃসন্দেহে এ ব্যবস্থা দ্বারা তিনি মুনাফিক ও মু'মিনের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করবেন। আমি স্বয়ং অনুভব করি, এ ঐশী ব্যবস্থাপনার সংবাদ পাওয়া মাত্র যেসব ব্যক্তি কোন ইতস্ততঃ না করে চিন্তিত হয়ে পড়েন ও সাকল্য সম্পত্তির দশমাংশ খোদার পথে দিয়ে দেন, বরং তার চেয়েও অধিক নিজেদের উৎসাহ দেখান, তারা নিজেদের বিশ্বস্ততার চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে থাকেন।'

আমি যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেসের (আইঃ) সাথে লন্ডনে সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন হুযূর (আইঃ) আমাকে ওসীয়্যতের ওপরে গুরুত্ব দিয়ে মুসীদের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমি যুগ-ইমামের উপরোক্ত নির্দেশ আপনাদের সামনে পেশ করলাম। যুগ-খলীফার আকাঙ্ক্ষার কথাও আপনাদেরকে অবহিত করলাম। এখন সময়ের চাহিদা হলো ওসীয়্যতের গুরুত্ব উপলব্ধি করার। যারা এখনও ওসীয়্যত করেন নি তাদেরকে ওসীয়্যত পুস্তকখানা কমপক্ষে ৩বার পাঠ করে ওসীয়্যত ব্যবস্থার সাথে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ২১তম সংখ্যা

১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ১২ রবিউল আউয়াল ১৪২৪ হিঃ কাঃ
১৫ হিজরত ১৩৮২ হিঃ শাঃ ১৫ মে ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

খিলাফত 'আলা মিনহাজিন নবুওয়ত

ধর্ম জগতে খিলাফতের ব্যবস্থা অপরিহার্য। হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা এ বিশ্বে প্রথম খেলাফত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর থেকে প্রত্যেক নবীর যুগেই তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ও পূর্ণতা দেয়ার জন্যে খিলাফত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও বহমান ছিলো। প্রত্যেক ধর্মীয় ইতিহাস পাঠক তা অবহিত আছেন। খিলাফত ব্যবস্থা ইসলামেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে নবুওয়তের পরে চিমনীস্বরূপ খিলাফত-ব্যবস্থা হলো ইসলামের দেহে আত্মা-বিশেষ। তাই সূরাতুন্ নূরের সপ্তম রুকূতে আল্লাহ্‌তাআলা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সবল, সুঠাম, সুনিয়ন্ত্রিত, সক্রিয়, গতিশীল এবং সকল প্রকার ভয়-ভীতি, শংকা, দুর্বলতা, শিরক তথা পদস্খলন থেকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ ও ছত্রছায়ায় খেলাফত-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এমন কি হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও কিয়ামতকাল ব্যাপী খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বহমানকল্পে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে একটি ঐতিহাসিক অবশ্য-ঘটনীয় পর্যায়ক্রমিক চিত্রের বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি (সঃ) বলেছেন- আমার নবুওয়ত যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তোমাদের মাঝে থাকবে। তারপর তিনি তা তুলে নিবেন। তারপর নবুওয়তের তরীকা-পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন তা তোমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা তুলে নিবেন। তারপর আত্মঘাতি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তা তোমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা তুলে নিবেন। তারপর জোর-জবরদস্তিমূলক বিচ্ছিন্ন শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন তোমাদের মাঝে তা ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর তা-ও তুলে নিবেন। এরপর তিনি পুনরায় নবুওয়তের তরীকা ও পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। এ পর্যন্ত বলে হুযূর (সঃ) নীরব থাকলেন (মিশকাতুল মাসাবিহ্; বাবুল ইনযার ওয়াত্ তানযীর, পৃষ্ঠা-৪৬১)।

বিগত চৌদ্দ শতাব্দীর ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা নবী করীম (সঃ) বর্ণিত উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত চিত্রটির হুবহু রূপায়ণ দেখতে পাই। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর নবুওয়তের পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উপরের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা প্রায় ৩০ বছর অব্দি প্রতিষ্ঠিত থাকার পরে খিলাফত-ব্যবস্থার চিরশত্রু ইবলীসি শক্তির চক্রান্তে কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার মাধ্যমে তখনকার মত প্রকৃত খিলাফত ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়। তারপর পর্যায়ক্রমে দামেস্কে উমাইয়া, বাগদাদে আব্বাসী, মিশরী ফাতেমী ও পরে তুরস্কে উসমানীয়া প্রভৃতি রাজতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; যদিও এ রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রগুলোকে খিলাফতের বস্ত্রাবরণে চালানো হয়, কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে এগুলোকে যথার্থই 'মুলকান আয্‌যান' ও 'মুলকান জাবারিয়ান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও এ নামসর্বস্ব খিলাফতের ইতি টানা হয় তুরস্ক পিতা মোস্তফা কামাল পাশার মাধ্যমে। এ সময়েই খিলাফত-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতঃ খিলাফত আন্দোলন চালানো হয়েছিলো জোরে-শোরে। অথচ এটা সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়। কেননা, আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক খিলাফত তিনিই প্রতিষ্ঠা করে থাকেন, মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় তা সম্ভব নয়। তাই যথাসময়েই আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে খিলাফত 'আলা মিন হাজিন নবুওয়ত অর্থাৎ নবুওয়তের তরীকা ও পন্থায় পুনরায় ইসলামে খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাঠামোগত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পরে হযরত হাজীউল হারামাঈন শরীফাঈন হাফেয মাওলানা হাকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর খিলাফতের মসনদে সমাসীন হওয়ার মাধ্যমে।

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দেখুন)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুন্ নূর - ২৪	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ খিলাফত	ঃ অনুবাদ - মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৪
অমৃত বাণী ঃ খিলাফতে আহমদীয়া কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - আল্ ওসীয়্যত পুস্তক থেকে	৪
জুমুআর খুতবা ঃ হামদ্-এর ব্যাখ্যা মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৭
সমস্ত বিশ্বের উপর রহমতুল্লিল আলামীন (সঃ)-এর আশীষ ও কল্যাণ মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৮
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্র 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৯-১১
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'রউফ' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১২
মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাহেঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৩-১৪
মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'	ঃ জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৫-১৬
খিলাফতের মকাম ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর নির্দেশাবলী মূল ঃ মৌলভী মোহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৭-১৮
কুদরতে সানীয়ার পঞ্চম পর্যায়ের পবিত্র সূচনা মূল ঃ মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৯-২০
মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	২১-২২
ছোটদের পাতা ঃ এস হাদীস শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২২-২৩
একটি প্রবন্ধ - একটি পর্যালোচনা	ঃ নির্বাহী সম্পাদক	২৪-২৫
পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে	ঃ	২৬
নতুনদের পাতা ঃ		
● পর্দা প্রগতির দিশারী	ঃ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৭-২৮
● পরবর্তী বুযুর্গানে দীনের অভিমত ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আইঃ)-এর আবির্ভাব	ঃ জনাব মৌঃ ইনামুল হক রনি	২৯-৩০
● উওহ্ বাদশা আয়া	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহ্সানুল হাবীব জয়	৩০-৩১
● দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন যাপনে ডায়েট ঠিক রাখুন	ঃ ডাঃ পারভীন হাকিম	৩২-৩৩
সংবাদ	ঃ	৩৪-৩৫

প্রচ্ছদ ঃ ওপরে- আল্লাহ্র পবিত্র ঘর খানায়ে কা'বা এবং নীচে-মদীনা মনওয়ারাস্থ মসজিদে নব্বী (সঃ)

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ)

এ খিলাফত ব্যবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন আল্লাহ্তাআলা তাঁর মাহ্দীর মাধ্যমে (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক দ্রষ্টব্য)। তবে তা অবশ্যই মু'মিন সমাজের ঈমান ও আমলে সালেহার সাথে শর্তযুক্ত। আজ সারা বিশ্বে ইসলামে আহমদীয়া খিলাফতের নেতৃত্বে তৌহীদের ঝান্ডা নিয়ে ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর বীর সেনানীরা ইসলাম প্রচারে ব্যস্ত। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সংঘটিত হবে। তখন সারা বিশ্বে ধর্ম বলতে বুঝাবে ইসলাম আর নেতা বলতে বুঝাবে আমাদের প্রিয় নবী মহানবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

আমরা আগেই বলে এসেছি, খিলাফত ব্যবস্থা মানবীয় প্রচেষ্টায় নয় আল্লাহ্র সরাসরি হস্তক্ষেপে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর তাজা নিদর্শন পৃথিবীবাসী দেখলো আহমদী জামাতের খিলাফতে আল্ খামেসা অর্থাৎ আহমদী জামাতের মাঝে পঞ্চম খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ইনতিকালের পর সারা বিশ্বের আহমদী জামাতের প্রতিনিধিরা ২২শে এপ্রিল, '২০০৩ লন্ডনের ফযল মসজিদে সমবেত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া ও কান্নাকাটির মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করলেন। খুবই শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এ নির্বাচন সম্পন্ন হলো ও সারা বিশ্বের আহমদী মুসলমানরা তাঁর (আইঃ) আনুগত্য করে নিলেন।

খিলাফত 'আলা মিনহাজিন নবুওয়তের কথা অনেকেই বলে থাকেন। ইদানিং বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন- "জুলুমতন্ত্রের পর বিশ্বে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবেই" (দৈনিক সংগ্রাম, ১৭-৩-২০০২)। কীভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হবে তিনি এর কোন পদ্ধতি বা রূপরেখা বর্ণনা করেন নি। আর করবেনই বা কীভাবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হলে তো কুরআনী শিক্ষানুযায়ী মু'মিন ও আমলে সালেহ সম্পাদনকারী লোক প্রয়োজন। নিশ্চয় তা তাঁর দলে নেই। যদি থেকে থাকে তাহলে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দিন না কেন? তিনি যদি বাংলাদেশে তাঁর জামাতের মাধ্যমে তথাকথিত খিলাফত প্রতিষ্ঠাও করেন তা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমানরা মানবে কি? সুতরাং খিলাফত 'আলা মিনহাজিন নবুওয়ত তাদের কাছে স্বপ্নের বস্তুই থেকে যাবে। আমরা তাদেরকে ঐশী নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত আহমদী খিলাফতের ঝান্ডা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ে অবদান রাখতে অনুরোধ করছি।

- নির্বাহী সম্পাদক

সূরাতুন্ নূর-২৪
(খেলাফত প্রসঙ্গে)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ
تَهْتَدُوْا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٥٥﴾

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও এ রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তা হলে এ রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যা তাকে অর্পণ করা হয়েছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব যা তোমাদেরকে অর্পণ করা হয়েছে। যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তা হলে তোমরা হেদায়াত পাবে। আর এ রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছে দেয়া।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِىْ
لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্যে তাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যাকে তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন, ও তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তাকে তিনি তাদের জন্যে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন; তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। আর এরপর যারা অস্বীকার করবে, তারা হবে দুষ্কৃতকারী। ২০৫৭

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং এ রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর কৃপা করা যায়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ
وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٥٨﴾

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করো না যে, যারা অস্বীকার করেছে তারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করতে পারবে, তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম আর উহা অতিশয় মন্দ পরিণামস্থল।

২০৫৭। যেহেতু খেলাফত সম্বন্ধে বিষয়-বস্তুর ভূমিকারূপ এই আয়াত প্রস্তাবনাস্বরূপ, সেহেতু পূর্ববর্তী ৫২-৫৫ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপর বার বার জোর দেয়া হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আয়াতটিতে এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, মুসলমানদিগকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহীত করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি সমগ্র মুসলিম জাতিকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু খেলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মানরূপে স্থাপিত হবে, যিনি হযরত নবী করীম (সঃ)-এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এখন মানব জাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথ-নির্দেশক, সে কারণেই তাঁর খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হয়ে যাবে। অপরাপর সকল নবীর উপর আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মধ্যে খেলাফতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। আমাদের বর্তমান যামানায় আঁ হযরত (সঃ)-এর এ সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক 'খেলাফত' পরিলক্ষিত হচ্ছে কেবল আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের মধ্যে যা আঁ হযরত (সঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক খলীফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে *(দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' পৃষ্ঠা- ১৮৬৯-১৮৭০)*।

খেলাফতকে মজবুতির সাথে ধর

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসিহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খেলাফতে নিহিত রয়েছে। নবুওয়ত একটি বীজ বপন করে যার পর খেলাফত উহার 'তাসীর' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। তোমরা খেলাফতে হাক্কাকে মজবুতির সাথে ধর এবং উহার আশিস ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর যাতে খোদাতাআলা তোমাদের উপর দয়া ও কৃপা বর্ষণ করেন, এবং তোমাদিগকে এই জগতেও উন্নত করেন, এবং সেই জগতেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের অঙ্গীকার পূরণ করে যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সন্তানদিগকেও তাঁদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাতে থাক। আমদীয়তের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের প্রকৃত সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং দুনিয়াতেও খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মচারীবৃন্দে পরিণত হন" [সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ), আল্ ফযল, ২০শে মে, ১৯৫৯ইং]।

হাদীস শরীফ

খিলাফত

হাদীস ঃ

আন হুযায়েফাতা (রাঃ) কূলা কূলা রসূলুল্লাহে (সঃ) তাকুনুন্ নাবুওওয়াতু ফিকুম মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহুতাআলা সুম্মাতাকুনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওওয়াতে মাশাআল্লাহু আন তাকূনু সুম্মা ইয়ারফাউহুহাল্লাতাআলা সুম্মা তাকূনু মুলকান আয্যান ফাতুকূনু মাশাআল্লাহু আন তাকূনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহুতাআলা সুম্মা তাকূনা মুলকান জাবারিয়্যাতান ফাতুকূনু মাশাআল্লাহু আন তাকূনু সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহুতাআলা সুম্মা তাকূনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন্ নুবুওওয়াতে সুম্মা সাকাতা।

অর্থাৎ হযরত হুযায়েফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। এর পর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্তালা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহতাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সঃ)-নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআন হ'তে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্তাআলা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার উপর সঠিকভাবে আমল করবে তখন আল্লাহ্র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) বলেন,

"কিছু লোক **ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াস তাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখ লাফাল্ লাযীনা মিন কাবলিহিম'** এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম'- (তোমাদের মধ্য হতে-অনুবাদক)- এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রাঃ) নিয়ে থাকেন। এবং বলেন, খেলাফত তাঁদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের নাম গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধপতনের অশুভ গর্তে নিপতিত হয়ে গেল।"

"এ আয়াতগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কীভাবে বলতে পারি যে, সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খিলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খিলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তবে মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?"

"যেহেতু কোন মানুষের জন্য স্থায়ীত্ব নেই তাই আল্লাহ্তাআলা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খিলাফত সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনো বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানে সে মুর্খতাবশতঃ খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদাতাআলার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূলে করীম (সঃ)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের খিলাফতের রজ্জুকে ধরে এর আশীষ হতে কল্যাণমন্ডিত হবার তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

খিলাফতে আহমদীয়া কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে

"অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্তাআলার বিধান এটাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান, সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদাতাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্যে সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সে প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সাথে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতাআলা বলেছেন ঃ

'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দিব'। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ-দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী যেন এরপর সেই দিবস আগমন করে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস। আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদেরকে সব কিছুই দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন যারা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন, অতএব তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামাতের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদিগকে এটাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত পরাক্রমশালী! স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট জানবে; তোমরা জাননা যে, সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামাতের পবিত্র বুযুর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়াত (দীক্ষা) নিবেন। খোদাতাআলা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপই বাস করুন বা এশিয়াতেই বাস করুন, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্র করেন। এটাই খোদাতাআলার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি" (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক থেকে পৃষ্ঠা ১৫-১৭)

হামদ-এর ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ২রা মে, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পরে সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে হুযূর খুতবা প্রদান করেন ঃ

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾

অনুবাদ ঃ "এবং আমরা তাদের অন্তর হতে বিদ্বেষের যা-ই থাকবে তা দূর করে দিব। নদ-নদী তাদের পাদদেশ দিয়ে বয়ে যাবে। এবং তারা বলবে সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্রই যিনি আমাদেরকে এ জান্নাতের দিকে পরিচালিত করেছেন, আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে হেদায়াত না দিতেন তাহলে আমরা কখনও হেদায়াত পেতাম না। নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিল। এবং তাদের নিকট ঘোষণা করা হবে, 'এটা সেই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী করা হোল তোমাদেরকে (পুরস্কারস্বরূপ), সেই কর্মের জন্য যা তোমরা করতে" (সূরা আল্ আরাফ ঃ ৪৪)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"হামদ এমন প্রশংসাকে বলা হয় যা কোন প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তির ভাল কাজের জন্য করা হয়। এবং এমন অনুগ্রহ বা নেয়ামত দানকারীর অনুদানের নামে যিনি নিজ ইচ্ছায় দান করেছেন এবং যিনি নিজের মর্জি মত নেয়ামত দিয়েছেন, অনুগ্রহ করেছেন। প্রকৃত অর্থে হামদ কেবল এমন সত্তার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য এবং প্রযোজ্য হয় যিনি সকল কল্যাণ ও নূরের উৎস এবং সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় জেনেবুঝে কাউকে পুরস্কার দেন, অজ্ঞতাবশতঃ বা কোন কারণে বাধ্য হয়ে নয়। এমন হামদ কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্র মাঝে পাওয়া যায়। একমাত্র তিনিই এমন অনুগ্রহ প্রদানকারী এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নেয়ামত কেবলমাত্র তারই পক্ষ থেকে। সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই

জন্য- ইহকালে ও পরকালে। সেসব প্রশংসা যা তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য করা হয় তা-ও মূলতঃ তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ্তাআলা হামদ শব্দের মাঝে তাঁর সমস্ত প্রধান মৌলিক সেফাতসমূহের (গুণাবলী) প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যা তাঁর মাঝে বিরাজমান।

দোয়ার বিষয়টি এমন একটি বিষয় যে, দোয়া ব্যতীত কোন মু'মিন তার জীবন-যাপনের চিন্তাও করতে পারে না।

যখন মু'মিনের দোয়া আল্লাহ্র ফযল ও রহমতের ফলে কবুল হয়ে যায় তখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে মু'মিনের হৃদয় আল্লাহ্র প্রশংসার গীত গাইতে শুরু করে। বিগত দিনগুলোতে আমাদের জামাতের ছোট বড় নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ সবাই কি গরীব আর কি ধনী সকলেই আল্লাহ্র দরবারে দোয়ায় এবং হৃদয়বিগলিত চিত্তে দোয়ারত হয়েছিল আল্লাহ্র দরবারে মাথা রেখে কান্না-কাটি করেছিল। ফলে আল্লাহ্ কেবলমাত্র নিজগুণে নিজ অনুগ্রহে আমাদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পরিবর্তন করেছিলেন (অর্থাৎ ৫ম খলীফার নির্বাচন-অনুবাদক)। আল্লাহ্র এ নেয়ামতকে পেয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ প্রিয় জামাত যেভাবে আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া ও হামদ জ্ঞাপন করেছে তা কেবল এ জামাতের মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন মানবমন্ডলীতে এর কোন নমুনা পাওয়া যায় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এ যুগে এ নিদর্শনই যথেষ্ট যদি কোন অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থেকে থাকে। আল্লাহ্তাআলা মু'মিনদের জামাতকে পরকালে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু তার চিহ্ন কেবল পরকালেই প্রদর্শন করেন না, বরং এ পৃথিবীর জীবনেও মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততার নিদর্শন প্রদর্শন করত, পরবর্তী জীবনের উদ্দেশ্যকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেন। এর নমুনা প্রতিদিনের যেসব চিঠিপত্র আমি পাই এর মাঝে দেখছি। দেখে আমার হৃদয় আল্লাহ্তাআলার হামদ-এ ভরে যায় যে, কীভাবে এক ব্যক্তি হাজার হাজার মাইল দূরে বসে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র খাতিরে কেবলমাত্র আল্লাহ্র খাতিরে যুগ-খলীফার সাথে আন্তরিক ভালবাসা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করছে। অপরপক্ষে এদিকেও সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়; বিদ্যুতের প্রবাহের মত তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে ও সে ধরনের আবেগ ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে যায়, আল্হামদুলিল্লাহ্, আল্হামদুলিল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহাম আছে, "সমস্ত প্রশংসা সেই খোদার যিনি আমার বেদনা দূর করেছেন এবং আমাকে এমন জিনিস দেখিয়েছেন যা এ যুগে তিনি আর কাউকে দেন নি" (আরবী থেকে অনুবাদ)।

তবে এমন আবেগ ও অনুভূতিকে এভাবে রেখে দিলে হবে না, দোয়া ও আল্লাহ্র হামদ্ সহকারে এর উত্তম থেকে উত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করার অঙ্গীকার করা উচিত। আমরা হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মান্যকারী ও অনুগত জামাত যিনি স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্র সাথে বিশ্বস্ততা ও শুকরগুযারীর উত্তম নমুনা রেখে গেছেন। আঁ হযরত (সঃ) মক্কায় প্রাথমিক যুগেও আল্লাহ্র শুকরগুযারী ও হামদ করতেন। আবার যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখনও আল্লাহ্র হামদ করছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনে ইসহাক

রেওয়ায়াত করেছেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আবূ বকর আমাকে বলেছেন, "মক্কা বিজয়ের দিন হযরত মহানবী (সঃ) সওয়া নামক স্থানে পৌছলেন, তখন হুযূর (সঃ)-এর চেহারা মোবারকের কিছু অংশ রেখা অংকিত চাদরে ঢাকা ছিল। মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্তাআলা তাঁকে (সঃ) যে বিরাট সম্মানের ও গৌরবের অধিকারী করেছিলেন তা স্মরণ করে আল্লাহ্র স্মরণে তাঁর (সঃ) মাথা এতটা নত হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর দাড়ী মোবারক উটের পিঠে স্পর্শ করার অবস্থা হয়েছিল।

আঁ হযরত (সঃ)-এর এ অবস্থাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"এমন প্রভাব যা আল্লাহ্র খাস বান্দাদের প্রদান করা হয় তা বিনয়ের আকারে প্রকাশ পায় এবং শয়তানের প্রভাব অহংকারের আকারে প্রকাশ পায়। দেখ, আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) মক্কার উপর বিজয় লাভ করেছিলেন তিনি সেভাবেই মাথা নত করেছিলেন, সিজদা করেছিলেন যেভাবে তিনি (সঃ) প্রাথমিক যুগে বহু কষ্টের যুগে সিজদা করতেন যখন তাঁকে এ মক্কাতেই বহু কষ্ট দেয়া হতো।"

"তিনি চিন্তা করলেন, কী অবস্থায় আমি মক্কা শহর ছেড়ে দিলাম, আর আজ কী অবস্থায় (বিজয় বেশে) মক্কায় এসেছি। একথা চিন্তা করে আল্লাহ্র হাম্দ বা শুকরগুযারীতে তাঁর (সঃ) হৃদয় ভরে গিয়েছিল এবং তিনি আল্লাহ্র হুযূরে সিজদা করেছিলেন।"

আল্লাহ্তাআলা আমাদিগকে এ বিষয়টিকে অর্থাৎ হামদ এর বিষয়াবলীকে প্রচলিত রাখার যোগ্যতা দান করুন। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি। হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার বলে 'সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি' তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়, তার পাপের পরিমাণ যদি সমুদ্রের পানির ফেনার মত (সীমাহীন)-ও হয়।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, দু'টি কলেমা (বাণী) এমন আছে যা মুখে উচ্চারণ করতে খুব সহজ কিন্তু ওজনে অনেক ভারী, রহমান আল্লাহ্র কাছে খুব প্রিয়। সে কলেমাদ্বয় হচ্ছে, "সুবহানাল্লাহে ওয়াবেহামদেহি সুবহানাল্লাহিল আযীম"। [অর্থ ঃ আল্লাহ্তাআলা অতি পবিত্রতার সাথে মহাপ্রশংসার অধিকারী, তিনি অতি পবিত্র এবং মহান"]।

আর একটি হাদীসে আছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আহ্বান করা হবে, 'হাম্মাদীন' দাঁড়িয়ে যাও।" একদল দাঁড়িয়ে যাবে, তাদের জন্য একটি পতাকা উড়ানো হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! এ হাম্মাদীন কারা? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, যারা জীবনে সকল অবস্থায় আল্লাহ্র হামদ করে, শুকরগুযারী করে।"

আল্লাহ্ করুন আমাদের জামাতে একজনও যেন এমন না হয় যে 'হামদ'-এর বাহিরে থাকে।

সাফল্য লাভের পর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সেজদা করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "এটি একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় যে, মু'মিন প্রত্যেক সাফল্যের পর আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য সিজদা করবে এজন্য যে, আল্লাহ্ এ নেয়ামতকে নষ্ট হতে দেন না। এ রকম শুকরগুযারীর ফল এই হবে যে, আল্লাহ্র সাথে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, ঈমানে উন্নতি হবে এবং এরপরে আরো আরো সাফল্য লাভ হবে। কারণ আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, "যদি তোমরা আমার নেয়ামতের শুকরগুযারী কর তবে আমি আমার নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দিব, আর যদি আমার নেয়ামতকে অস্বীকার কর তাহলে আযাবের মধ্যে পতিত হবে। (আল্লাহ্র) এ নীতিকে সর্বদা স্মরণ রাখ। মু'মিনের কাজ এটাই যে, যে কোন সাফল্য লাভের পর সে লজ্জাবোধ করে এবং আল্লাহ্র হামদ (প্রশংসা) করে যে তিনি অনুগ্রহ করেছেন। এভাবে সে অগ্রসর হতে থাকে এবং ঈমান লাভ করতে থাকে।"

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, 'প্রকৃত অনুগ্রহ' যা সৃষ্টির মাঝের কারো কোন কৃত-কর্মের বিনিময়ে নয়, এমন অনুগ্রহ মু'মিনের হৃদয়কে আল্লাহ্র প্রশংসা, আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা ও হামদ-এর প্রতি আকৃষ্ট করে। অতএব সে খাঁটি অন্তরে ও পবিত্র নিয়্যতে নিজ অনুগ্রহকারীর প্রশংসা ও হামদ করে। এভাবে কোন সন্দেহ ও দুশ্চিন্তার উর্ধ্বে উঠে রহমান খোদা অবশ্যই প্রশংসার পাত্র হয়ে যান। কারণ এমন সত্তা যিনি মানুষের কোন পাওনা বা যোগ্যতা ছাড়াই তার ওপর অনুগ্রহ ও নেয়ামত দান করেন- এমন সত্তার প্রশংসা সকলেই করবে যারা তাঁর থেকে নেয়ামত পেয়েছেন। এটা মানুষের প্রকৃতি এবং স্বভাবও বটে। তারপর যখন নেয়ামতের পরিপূর্ণতার কারণে হামদ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় তখন তা পূর্ণ ভালবাসার কারণও হয়ে যায় এবং এমন অনুগ্রহকারী নিজ অনুরক্ত ও প্রিয়জনদের দৃষ্টিতে অনেক বেশি প্রশংসার পাত্র ও প্রিয়তম হয়ে যান এবং এটা রহমানীয়তের প্রতিফলন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একস্থানে বলেছেন,

"তিনি প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই হামদ হচ্ছে। হামদকারীরা (গুণকীর্তনকারীরা) সবসময় তাঁরই গুণগান বা হামদ্ করতে ব্যস্ত আছে এবং তারা আল্লাহ্র স্মরণে মগ্ন আছে। কোন কিছুই এমন নেই যা সর্বদা তাঁর প্রশংসার গুণগান করতে রত থাকে না। যখন তাঁর বান্দা নিজ কামনা-বাসনার আবরণকে সরিয়ে রাখে, নিজের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্র পথে, আল্লাহ্র ইবাদতের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেয়; নিজ প্রভু বা মালিককে চিনে ফেলে যিনি তার লালন-পালন করেছেন, সে সারাক্ষণ তাঁর হামদ করে, পুরো মাত্রায় সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালবাসে, নিজ শরীরের প্রতি কণা দিয়ে তাকে ভালবাসে তখন সে ব্যক্তি আল্লাহ্র আলমসমূহের একটি আলম (জগৎ) হয়ে যায়। এমনই আর একটি আলম (জগৎ) সেই আলম যাকে আল্লাহ্তাআলা নিজ অনুসন্ধানীদের প্রতি করুণাবশতঃ শেষ যুগে অপর এক জামাতের মাঝে সৃষ্টি করবেন। এ সম্পর্কে তিনি কুরআনের আয়াত, "লাহুল হামদু ফিল উলা ওয়াল আখিরা"-এর মাঝে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে আল্লাহ্তাআলা দু'জন আহমদ (প্রশংসাকারী) হামদকারীর কথা বলেছেন। উভয় আহমদকে তাঁর অগণিত নেয়ামতের অধিকারী বলে গণ্য করেছেন। প্রথম আহমদ হলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এবং দ্বিতীয় আহমদ হলেন, ইমাম আখেরুয্

যামান, অনুগ্রহকারী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার নাম 'মসীহ' এবং 'মাহ্‌দী'ও রাখা হয়েছে। এ তত্ত্ব আমি আল্লাহ্‌র কালাম 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন' থেকে ঐশী-জ্ঞান হিসাবে লাভ করেছি। সুতরাং প্রত্যেক বিবেকবান চিন্তাশক্তির অধিকারী ব্যক্তিদের বিবেচনা ও চিন্তা করা উচিত।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন,

"আমি আরো একটি কথা বলতে চাই, জরুরী উপদেশ দিতে চাই, তোমরা যেন হাবলুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র রজ্জুকে)-কে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ। তোমাদের জীবন পদ্ধতি বা জীবন বিধান যেন কুরআন হয়। তোমাদের মাঝে পরস্পর কোন বিরোধ-বিবাদ যেন না থাকে। কারণ বিরোধ-বিবাদ আল্লাহ্‌র রহমতের ধারা বা প্রবাহকে রোধ করে বাধা দেয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীরা এ দুর্বলতার কারণে জঙ্গলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসারী মুসলমানরা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন এবং সাফল্যমন্ডিত হয়েছিলেন। এবার তৃতীয়বার তোমাদের পালা এসেছে। অতএব তোমাদের অবস্থা তোমাদের ইমামের হাতে যেন এমন হয় যেমন কোন মৃতদেহ সেই গোসলদান-কারীদের হাতে থাকে যারা সে মৃতদেহকে গোসল দেয়। তোমাদের সকল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা যেন এমন হয়, তোমরা নিজেদেরকে ইমামের (অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে) সাথে এমন এমনভাবে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত কর যেমন রেল গাড়ীগুলো ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত থাকে। তারপর দেখ প্রতিদিন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাচ্ছ কি না (অর্থাৎ যাচ্ছ)।

অনেক বেশি বেশি ইস্তিগফার পড়তে থাক এবং দোয়ারত থাক। ঐক্যকে হাত ছাড়া হতে দিবে না। অন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং সকল বিষয়ে সদাচরণ করতে অবহেলা করবে না। তেরশ' বছর পরে আজ এ যুগ তোমরা লাভ করেছ (খিলাফতের যুগ) আগামীতে কিয়ামত পর্যন্ত কখনও এমন যুগ পুনরায় ফেরত আসবে না।

অতএব এ নেয়ামতের (খিলাফতের) জন্য শোকরগুযার হও। কারণ শুকরগুযারী করলে নেয়ামত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। **লাইন শাকারতুম লাআযিদান্নাকুম** (যদি শুকরগুযারী কর নেয়ামত বাড়িয়ে দিব)। কিন্তু যারা শুকরগুযার হয় না তারা যেন স্মরণ রাখে, **ইন্না 'আযাবী লাশাদীদ** (নিশ্চয় আমার আযাব বড় ভয়ানক)।

আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক আহমদীকে-এর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব) থেকে নিরাপদে রাখুন এবং চিরদিন খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি ইলহাম ঃ (আরবী থেকে অনুবাদ) "আমরা তোমার প্রশংসা করি, তোমার প্রতি দুরূদ পাঠ করছি। আল্লাহ্‌র নূরকে মানুষেরা মুখের ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা এ নূরকে ছেড়ে দিবেন না যতদিন এটা পূর্ণতা লাভ না করে, যদিও অস্বীকারকারীরা এমনটা পসন্দ করে না। আমরা শীঘ্রই তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করব। যেদিন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং যুগের মানুষেরা আমার দিকে ফিরে আসবে, বলা হবে, এটা কি সত্য ছিল না"?

অবশেষে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। গত খুতবায় আমি এক বন্ধুর পত্রের কথা বলেছিলাম। আমার কথা শুনে কেউ কেউ অনেক জোরালো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমি যে বন্ধুর পত্রের কথা গতবার বলেছিলাম, তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। আল্লাহ্‌র ফযলে সেই ব্যক্তি পুণ্যবান পরিবারের পুণ্যবান ব্যক্তি। যেভাবে সে ভেবেছে সেভাবে তার মতামত ব্যক্ত করেছে। আমার মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা জামাতের সকলের সামনে তুলে ধরি। কারণ আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, সমবেদনার চাদর পরে এ ধরনের আলোচনা যেন জন সমক্ষে চলতে না থাকে। এভাবে কোন নিবোর্ধ কোথাও যেন হোঁচট না খায়। আল্লাহ্‌র ফযলে জামাত অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্‌তাআলা বর্তমান যুগে জামাতের তরবিয়তের জন্য এম.টি.এ-র মত নেয়ামত প্রদান করেছেন। তৎক্ষণাৎ সমগ্র জামাতের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। অতএব এ ধরনের কথা উল্লেখ করে জামাতকে অবগত রাখা আমার জন্য একান্তই আবশ্যক। চিঠিপত্রের মাধ্যমে মনোভাবের আদান-প্রদান হয়, সান্ত্বনা-সহযোগিতা প্রদর্শন করা যায়। জাযাকুমুল্লাহ্। আমার নিজের মাঝে আমার আত্ম-বিশ্বাসের সাহসিকতার কোন অভাব নেই আল্লাহ্‌র ফযলে। চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু জামাতের প্রয়োজনে কোন কোন কথা আমাকে বলতেই হয়।

কেউ কেউ লিখেছেন, এমন কথার উল্লেখের তেমন প্রয়োজন ছিল না। কঠোরতা প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে বড় স্নেহের সাথে আমি বলে রাখছি, আমার অন্তরেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এ জামাতের প্রতি গভীর ভালবাসা আছে। কোথায় কঠোরতা আর কোথায় নম্রতা প্রদর্শন করা দরকার, আল্লাহ্‌র ফযলে তা আমি ভালই জানি। আল্লাহ্‌র ফযলে আল্লাহ্‌র দেয়া যোগ্যতা বলে সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করব।

আল্লাহ্ আমাকে তাঁর মর্জিমত, পসন্দমত উপায়ে কাজ করার তৌফীক দান করুন। তারপর আবার বড় স্নেহের সাথে বলছি, জামাতের ভালর জন্য যা করণীয় বলে মনে করব অবশ্যই তা করব। কারো জন্য এমন মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই যে, আমি যা করেছি তা করার প্রয়োজন ছিল না। যখন বলে দিয়েছি, তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা জামাতের জন্য মঙ্গলজনক হবে। আল্লাহ্ যদি না চান, তিনি মহাজ্ঞানী ও সব অবগত আছেন, তিনি যা না চান তা আমার অন্তর থেকে সরিয়ে দিবেন। এ সম্পর্কে আমি কারো কোন মন্তব্যের প্রয়োজন মনে করি না যে, কেন বললাম?

তবে হ্যাঁ, সকল অবস্থা সম্পর্কে আমাকে অবগত রাখবেন, যেন তরবিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে যা বলার প্রয়োজন হয় বলতে পারি। অবশেষে আবার বলছি এ বিষয়টা যেন এখানেই শেষ করা হয়। এ ব্যাপারে আর কোন পত্র লিখবেন না।

হ্যাঁ, আপনারা আপনাদের ভালবাসা, আন্তরিকতা বিশ্বস্ততার কথা প্রকাশ করুন। আল্লাহ্‌র হামদ ও শুকরগুযারীর গীত গেয়ে গেয়ে দোয়া করতে করতে এ কাফেলাকে (অর্থাৎ আহমদীয়তের অগ্রযাত্রাকে) এগিয়ে নিয়ে চলুন।

(ক্যাসেট থেকে ধারণকৃত)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সমস্ত বিশ্বের উপর রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ)-এর আশীষ ও কল্যাণ

মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(দ্বিতীয় কিস্তি)

যুগের জন্য রহমত

এবার আমার দৃষ্টি যুগের প্রতি নিবদ্ধ হোল। আমি বললাম, সময় কত লম্বা, কত দীর্ঘ! কবে থেকে ফিরিশ্‌তারা কর্মরত আছেন? কবে থেকে সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছে? কে বলতে পারে, এ যুগ কত পরিবর্তন দেখেছে? কতকাল থেকে সে কীভাবে খুশী ও দুঃখের আঁধার তৈরী করে আসছে? যদি সে একটি প্রাণী হোত এবং এভাবে সে অনাদিকাল ধরে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকত তবে এটা তার জন্য কত গৌরবের বিষয় হোত! আমি চিন্তা মগ্নই ছিলাম। হঠাৎ যুগের চেহারার ওপর দু'টি দাগ আমার চোখে পড়ল। আমি শুনলাম, কিন্তু লোক বলছে, যুগের আদি অন্ত নেই তার বিনাশ নেই। যুগ আল্লাহ্‌র মতই অনাদি। যার শুরুও নেই শেষও নেই। আবার কেউ কেউ বলছিল, যুগ বড় অত্যাচারী। সে তো আমার অমুককে মেরে ফেলেছে। যুগ বড় মন্দ! সে আমার ওপর ধ্বংস এনে দিয়েছে। আমি বললাম, যুগ যদি প্রাণ রাখত তবে সে এসব কথা শুনে ব্যথিত হোত। হঠাৎ আবার সেই সুর সেই আওয়াজ উচ্চারিত হোল। সে সূর বলল, "যারা বলে, যুগ আমাদের স্বজনদের মেরেছে; ধ্বংস করেছে বা সে খোদা, তারা ভুল বলে। তারা আসলে সত্যকে জানে না। মেরে ফেলা বা ধ্বংস করা তো আল্লাহ্‌র কাজ! তিনি যতকাল কাউকে বয়স দেন সে ততদিন জীবিত থাকে। যুগ তার সাথে সঙ্গ দিয়ে যায়। তারপর সে বলল, যুগ কী? আল্লাহ্‌র সিফত বা গুণের বিকাশ। সুতরাং তোমরা যারা তাকে গালি দাও, তোমরা তো আল্লাহ্‌কে গালি দিচ্ছ। আমার হৃদয় সেই সুর এবং বাণীর আরো নিকটবর্তী হোল এবং আমি আমার হৃদয়ে ভালবাসা নিয়ে তাকে বললাম, 'এ আওয়াজ তো যুগের জন্যও রহমত বলে প্রমাণিত হয়েছে।'

পৃথিবীর জন্য রহমত

তারপর আমার দৃষ্টি পড়ল পৃথিবীর ওপর। আমি বললাম, আমাদের এ পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের চেয়ে তো কম সুন্দর নয়। বরং বাহ্যতঃ বেশি সুন্দর বলেই মনে হয়। কারণ সেখান থেকে কেবল আলোই এসে থাকে। এখানে তো আলো ছাড়াও বহু প্রকার সবুজ গাছপালা, ফলমূল, ফুল, বহু সুদৃশ্য অঞ্চল, কতপ্রকার পাহাড়, কুলুকুলু নাদে প্রবাহিত নদীনালা, বহমান ঝর্ণা; কত সুন্দর বাগান, উপত্যকা, ফল-ফুলে ভরা গাছ গাছালি, কত চমৎকার ক্ষেত-খামার; বহু শস্য ভরা খামার বাড়ী, খলিয়ান, কত রকমের কলরবমুখর পাখীর দল। কত গৃহপালিত পশু দৌড়াদৌড়ি করছে। আরও কত কী! আমাদের বসুন্ধরা আমার এত ভাল লাগছিল যে, এতে বিচরণকারী হিংস্র জানোয়ার, পশু, সাপ, বিচ্ছু, অন্যান্য বিষাক্ত পোকামাকড়; মশা-মাছি; প্লেগ বহনকারী ইঁদুরও ভাল লাগছিল। আমি কল্পনা করছিলাম, হিংস্র-ব্যাঘ্র যদি না থাকত, শের আফগান এর মত লোক কীভাবে সৃষ্টি হতো। যদি সাহসী সিংহ না থাকত তবে মানুষের সাহসিকতার পরিচয় কী করে পাওয়া যেত? হয়ত তখন মানুষ মানুষের ওপর আক্রমণ করে সাহসিকতার পরিচয় দিত। আর এসব পশু জীবিত থেকেও মরে আমাদের কাজে লাগে। এর চর্বি নখ, চামড়া বিভিন্ন চিকিৎসার কাজে লাগে। সৌন্দর্যের কাজে পোশাকের কাজে লাগে। আমি বললাম, যদি সাপ না হতো তবে হেকীম সাহেবেরা সাপের বিষের প্রতিষেধক কোথা থেকে আবিষ্কার করতেন। বিচ্ছু যদি না থাকত তবে কিডনীতে পাথরী যাদের আছে তারা অস্ত্রপচার ছাড়াই কীভাবে আরাম পেত? আমি তো মশাকে বর্ষার আগমনের সংকেত হিসাবে দেখছি।

এত ছোট একটি প্রাণী সে কীভাবে রাত দিন আমাদেরকে জাগাতে থাকে। সে আমাদের বলে দেয়, শহরের ময়লা-আবর্জনায় কী পরিমাণ রোগজীবাণু আছে? পানির মত এমন নেয়ামতকে মানুষ এভাবে নষ্ট করে। বস্তুত রাত দিন আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করতেই থাকে অথচ আমরা জাগ্রত হই না, আর আমরা অলসতাও পরিত্যাগ করি না (সে যখন তখন রাগ করে আমাদেরকে কামড় দেয়) রোগবালাই এতটা মশার মাধ্যমে বিস্তার করে না যতটা তরল পদার্থের অপব্যবহারের ফলে আবর্জনাময় গৃহের নালার দুর্গন্ধের ফলে,অগণিত রোগ জীবাণু ভরা আবর্জনার ফলে, অসাবধানতাবশতঃ পানি ফেলার দরুন রোগ ছড়ায়।

এভাবে প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার সৌন্দর্য দেখতে থাকলাম। প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মাঝে চিরঞ্জীব প্রিয়তমের চেহারা দেখতে থাকলাম। কিন্তু নিজের অজান্তে আমার দৃষ্টি জনবসতির মাঝে গিয়ে পড়ে গেল। আমি দেখলাম, মানুষ পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, পাথর, নদী এবং পশুর সামনে সেজদাবনত হচ্ছে এবং আসল সার-বস্তুকে ভুলে খোসাকে ভালবেসে তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছে। আমার মন খারাপ হয়ে গেল, মনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে গেল। সাপ, বাঘ, বিচ্ছু তো দূরের কথা পরিষ্কার পানির মাঝে লক্ষ লক্ষ জীবাণু, কীট, দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। খুব চমৎকার বাগান, সবুজে ভরা বাগানের সৌন্দর্যের মাঝেও পচা সুবজ পাতার দুর্গন্ধ, মাথা খারাপ করে দেবার মত দুর্গন্ধ পেতে লাগলাম। মনে হোল, এ পৃথিবী একদিনও বসবাসের উপযুক্ত নয়। এমন মনে হোল, এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস প্রাণহীন। এবং এ দৃশ্য এক বৃদ্ধা পতিতার মত বিশ্রী। এমন যে, হাজার রকম প্রশাধনী ব্যবহার করলেও তার বিশ্রী চেহারা তার দুশ্চরিত্রকে লুকানো যাবে না। আমি এমন অবস্থায় ছিলাম। যখন হঠাৎ সেই সুর বেজে উঠল, সেই বাণী উচ্চারিত হতে আরম্ভ করল। বড় মিষ্টি কণ্ঠের আওয়াজ, হৃদয়কে বিমোহিতকারী শব্দ শুনলাম। বলা হোল ঃ এ পৃথিবী এবং যা কিছু এর মাঝে রয়েছে সব কিছুই মানুষের মঙ্গলের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পাহাড়, এর পাখী, এর ফল, এর শস্য। এ সুরের একই উদ্দেশ্য এই যে, মানুষে কর্মকান্ডের মাঝে যেন নতুনত্ব সৃষ্টি হয়। সে যেন নিজ কর্মগুণে এ সমস্ত নেয়ামতের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করে। এ জগতের সমস্ত কিছু তা সুন্দর দেখাক বা অসুন্দর দেখাক, এ সমস্ত কিছু মানুষের পরীক্ষার জন্যে। সুতরাং ধন্যবাদ তাকে যে এ বাণী থেকে কল্যাণ লাভ করে এবং নিজ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করে।" উক্ত আওয়াজ বা ধ্বনি যেই মাত্র উচ্চারিত হোল- মনে হোল, এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্টির উপর থেকে ভারী বোঝা সরে গেল, এ পৃথিবীকে জান্নাত মনে হতে লাগল। এমন মনে হতে লাগল, যেন পরকালের জান্নাত ইহকালের জান্নাতের ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক মানুষ যারা সেই আওয়াজ বা উচ্চারিত বাণী শুনেছিল- তারা নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে শিরক ও বিদআত হতে তওবা করে নিজ সৃষ্টিকর্তার দিকে দৌড় দিতে লাগল। এভাবেই এ পৃথিবী মহাপ্রতাপশালী খোদার বিকাশস্থল হয়ে গেল। এখন তো এখানে আল্লাহ্‌র কত শত ঐশী নিদর্শন প্রদর্শিত হতে লাগল। আমি আবার একবার বুক ভরা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'সে আওয়াজ পৃথিবীর জন্যও রহমত কল্যাণ প্রমাণিত হোল'। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ্‌তাআলার সিফত 'নূর' সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা

পৃথিবীর সমস্ত কিছুর উপরেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রহমতের ছায়া বিস্তৃত আছে। অগণিত পাপী মানুষ হুযূর (সঃ)-এর শাফায়াতের মাধ্যমে ক্ষমা পেয়ে যাবে। অতএব তোমরা রাতদিন হুযূর (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করতে থাক।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ২০ ডিসেম্বর, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহেঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দিয়েছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

অনুবাদ ঃ "এবং লোকদের মাঝে কতক এমন আছে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করে দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এরূপ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল (সূরা আল্ বাকারা ঃ ২০৮)।

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবূ কাতাদা নিজ পিতা আবূ কাদাতা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে রেওয়ায়াত করেছেন, হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলেছেন, 'আমি নামাযে দাঁড়িয়ে মনে করি নামায লম্বা করব। কিন্তু যখন কোন শিশুর কাঁদার শব্দ শুনি তখন তাতে আমার মন বিগলিত হয়ে যায় এবং মনে হয় সেই শিশুর মা হয়ত কষ্ট পাবে তখন নামায সংক্ষিপ্ত করি' (বুখারী)।

[কিতাবুল জামাআত ওয়াল ইমামত, বাব মান আখাফ্‌ফাস্ সালাত ইন্‌দা বুকায়েস্ সাবীয়ে]

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা **রউফুম্ বিল ইবাদ** বান্দাদের প্রতি দয়ালু। কারণ তাঁর মাঝে খুব বেশি দয়া আছে। তিনি সামান্য পুণ্য কর্মের বিনিময়ে চিরস্থায়ী নেয়ামতের বাগান (জান্নাত) তৈয়ার করেছেন। কর্ম স্বল্পস্থায়ী কিন্তু পুরস্কার চিরস্থায়ী। তাঁর রা'ফত বা কৃপার মাঝে এ কথাও আছে, তিনি কোন প্রাণের ওপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপান না। তাঁর দয়ার মাঝে এত বেশি দয়া, কোন ব্যক্তি একশ' বছর পর্যন্ত অবিশ্বাসী থাকলে তারপর মৃত্যুর পূর্বে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তবুও সমস্ত আযাব হ'তে মুক্তি লাভ করে চিরস্থায়ী পুরস্কারের অধিকারী হয়ে যায়। তাঁর দয়ার

মাঝে এ কথাও আছে, বান্দা যে জান-মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে তা তো আল্লাহ্‌রই দেয়া।"

কবি বলেছেন, **জান দি, দি হুয়ি উসিকি থি, হক তো ইয়ে হ্যায় কেহ্ হক আদা নাহুয়া**

(অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছি, এ প্রাণ তো তাঁরই দেয়া ছিল। অতএব সত্য এই যে, দায়িত্ব পালন হোল না বা যথাযথ প্রতিদান দেয়া গেল না।)

এ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রহমত কম হয় না।

আল্লামা আবুল হাইয়ান আন্দালুসী লিখেছেন, "রাফ'ত শব্দ রহমতের চেয়ে বেশি গভীরতা রাখে।"

আমি অবশ্য তাঁর সাথে একমত নই। আমার মতে রহমত বেশি গভীরতা রাখে কারণ- রা'ফত কেবল মু'মিনদের জন্য। কিন্তু রহমত সমস্ত সৃষ্টির জন্য। বলা হয়েছে, রহমাতুলল্লিল আলামীন সমস্ত জগতের জন্য রহমত। যতদূর আমার স্মরণ আছে আমি উদাহরণ পেশ করব। আপনারা আশ্চর্য হবেন যে, আঁ হযরত (সঃ) কত বেশি রহমতের ছিলেন ছোটদের জন্য, বড়দের জন্য; পশু-পাখীর জন্য; প্রত্যেকের জন্য। তাই আবুল হাইয়ান এর সাথে আমি একমত নই যে, রা'ফত বেশি গভীরতা রাখে।

আবূ জাহলের ছেলে ইকরামা জীবনের এক অংশে আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছে। মক্কা বিজয়ের পরে সে মক্কা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে বড়ই বিদ্বেষ রাখত নিজ পিতা আবূ জাহলের কারণে। ইকরামার স্ত্রীর মাঝে সম্ভবতঃ কিছু পুণ্য ছিল। স্ত্রী গিয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হুযূর (সঃ) ক্ষমা করে দিলেন। তারপর ইকরামাকে ফিরিয়ে আনতে লোক পাঠানো হলো। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, তার ক্ষমা হতে পারে। ইকরামা ফেরত আসলে হুযূর (সঃ) তাকে আদর করে সামনে বসালেন। ইনি পরবর্তীতে হযরত ইকরামা হয়ে এক যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছিলেন। বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। যে ব্যক্তি ইকরামা (রাঃ)-কে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন তার হাতে হুযূর (সঃ) তার নিরাপত্তা-পত্র প্রদান করেছিলেন। তাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে যে, ফেরত আসলে তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না। হুযূর (সঃ) পসন্দ করতেন না যে, কেউ আবূ জাহলের নামে ইকরামার প্রতি কোন কটাক্ষ করুক। কখনও কখনও কেউ তাকে ইকরামা বিন আবূ জাহল বললে তা-ও যেন বলা না হয়- এ আদেশ দিয়েছিলেন। কারণ আবূ জাহল বড় জালেম ছিল। ইকরামা এখন মুসলমান হয়েছেন। এখন বাপের কথা স্মরণ করালে তার মনে কষ্ট হবে হয়ত, এত বড় জালেম বাপের সন্তান সে!

অতএব আমি মনে করি রা'ফত শব্দের রহমত বেশি ব্যাপকতা ও গভীরতা রাখে। রা'ফত এতটা নয়। হুযূর (সঃ) রহমতুল্লিল আলামীন ছিলেন। আঁ হযরত (সঃ) ছোট বড়, পশু-পাখী, গাছ পালা সব কিছুর জন্যই রহমত ছিলেন। রা'ফত এতটা ব্যাপকতা রাখে না।

মওলানা হালি তার এক নযমে লিখেছেন ঃ

"তিনি নবীগণের মধ্যে 'রহমত' উপাধি পেয়েছেন, তিনি গরীবদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণকারী হয়েছেন। তিনি এতীমদের অভিভাবক গোলামদের আশ্রয়স্থল হয়েছেন। তিনি হেরা গুহা হতে বেরিয়ে জাতির সামনে এসেছিলেন। তিনি এক অপূর্ব ব্যবস্থা-পত্র সাথে নিয়ে এসেছিলেন।"

সেই অপূর্ব ব্যবস্থাপত্র কুরআন মাজীদ। এটি এমন এক ব্যবস্থা-পত্র যার মাঝে শারীরিক রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাও ছিল, আধ্যাত্মিক রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা তো ছিলই। সম্পূর্ণরূপে রূহানী ব্যবস্থা-পত্রই ছিল। এর মাঝে এমন সূরাও আছে যার নামই শিফা 'রোগ নিরাময়কারী' যেমন, সূরা ফাতিহা। সূরা ফাতিহার এক নাম শিফা। একবার কিছু সাহাবায়ে কেরাম কোন এক সফরে ছিলেন। ইসলামের শত্রু এক বেদুঈন সর্দারের কঠিন মাথা ব্যথা হয়েছিল যে, সে সহ্য করতে পারছিল না। সেই সরদারের লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের কাছে সরদারের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইল। সাহাবায়ে কেরাম তাকে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়ে দিলেন। সরদার সুস্থ হয়ে উঠল। এবং অনেক মাংস এবং আরো খাদ্য সাহাবায়ে কেরামকে উপহার দিল। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিল, সূরা ফাতিহার বিনিময়ে পাওয়া এসব খাবার গ্রহণ জায়েয হবে কি না। কুরআন মাজীদের বাহ্যিক বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা জায়েয হয় না। অনেকেই সেই খাবার গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছিলেন না। অন্যরা বলছিলেন, আমরা তো বিক্রি করি নি। কুরআন দিয়ে তার উপকার করেছি। যখন তারা মদীনায় ফেরত এসে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে বিষয়টি পেশ করলেন। হুযূর (সঃ) বললেন, তোমরা কী করে বুঝলে, এ সূরা পড়ে ফুঁ দিলে (শিফা) আরোগ্য হবে? সাহাবা বললেন, আমরা জানতাম না। তখন হুযূর (সঃ) বললেন, আল্লাহ্ এর মাঝে আরোগ্য ক্ষমতা রেখেছেন। তোমাদেরকে সেই সরদার যে, গোশ্ত দিয়েছিল তার কিছু থাকলে আমাকে দাও, আমিও খেয়ে দেখি। সুতরাং হুযূর (সঃ) ও সামান্য কিছু খেয়েছিলেন।

আঁ হযরত (সঃ) শিশুদের জন্যও রহমত ছিলেন। গাছ-গাছালির জন্যও হুযূর (সঃ) রহমত ছিলেন। হুযূর নবীয়ে করীম (সঃ)-এর মিম্বরের (খুতবা-মঞ্চ) সাথে একটি গাছের টুকরা স্থাপিত ছিল যার ওপর হাত রেখে তিনি খুতবা দিতেন। একবার হুযূর (সঃ) মনে করলেন- সেই গাছের থেকে তিনি ক্রন্দনের শব্দ পাচ্ছেন। হুযূরের (সঃ) খুব মায়াবোধ হোল ওটার প্রতি এবং তিনি ওটার ওপর হাত রাখলেন। সাথে সাথে ওটা থেকে ওরকম শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। সেই অর্ধমৃত গাছের অংশটির জন্য হুযূর (সঃ) মমতা বোধ করতেন।

একবার তিনি একটি উটের ডাক শুনলেন। তাঁর (সঃ) মনে হোল, হয়ত এর মালিক এর প্রতি অবিচার-অত্যাচার করেছে। হুযূর (সঃ) কষ্ট পেলেন তার জন্য। তিনি সেই উটের মালিককে টাকা দিয়ে উটটি কিনে নিলেন (সঃ) এবং তার বন্ধনমুক্ত করে দিলেন যেন সে স্বাধীনভাবে বেড়াতে পারে।

আঁ হযরত (সঃ) শিশুর কাঁন্নার শব্দ পেয়ে নামায ছোট করে পড়াতেন। তাছাড়া কোন মা যদি সন্তান হারাত তার জন্য হুযূর (সঃ) বড় ব্যথা বোধ করতেন। একবার এমনই সন্তান হারা এক মা ঘুরে ফিরে বিভিন্ন শিশুকে আদর করছিল। আঁ হযরত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা কি মনে কর, এমন মা তার সন্তানকে জাহান্নামের আগুনে ফেলতে পারবে? আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের প্রতি এ মায়ের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। আঁ হযরত (সঃ)-এর একটি ফার্সী ইলহাম আছে ঃ

'ই মুশ্‌তে খাকরা গার না বখ্‌শেম, চেকুনেম।' (অর্থঃ) "মাটির এ দলাকে ক্ষমা না করে কী করব?" সুতরাং সকল দিক থেকেই আঁ হযরত (সঃ)-এর হৃদয়ে অনেক বেশি রহমত ও মমতা বোধ ছিল। আজ আমার হাতে কোন নোট নেই। মৌখিক ও তাৎক্ষণিক যা চিন্তা করছি তা-ই বলছি।

উটের কথা বললাম, শিশুদের কথা বললাম। বড়দের জন্যও রহমত ছিলেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, 'যারা বড়দের সম্মান করে না তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'। তাঁর (সঃ) রহমত সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। কোনভাবেই তাঁর (সঃ) রহমত কখনই কারো জন্য সংকুচিত হোত না। ইহকালেও না, পরকালেও না। অন্য কোন নবীকে রহমাতুল্লিল আলামীন উপাধি দেয়া হয় নি। কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে রাহমাতুল্লিল আলামীন বলা হয়েছে। অতএব তাঁর (সঃ) কৃপার ছায়া ইহজগতেও বিস্তৃত পরজগতেও বিস্তৃত। পরকালে তাঁর (সঃ) সুপারিশে অনেক পাপী মানুষ ক্ষমা পেয়ে যাবে। এতে করে বুঝা যায় যে, তাঁর (সঃ) রহমত পরকালেও ক্রিয়াশীল থাকবে। একবার তিনি তাঁর (সঃ) কিছু সাহাবীকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি (সঃ) সাথে সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন করলেন, "উসায়হাবী, উসায়হাবী" এরা তো আমার সাহাবা, এরা তো আমার সাহাবা, এদের যে জাহান্নামে নেয়া হচ্ছে!' তখন আল্লাহ্ হুযূর (সঃ)-কে বলবেন, 'এরা পৃথিবীতে তোমার জীবদ্দশায় কী করেছে (তা তোমার জানা আছে) তুমি তাদের নিগ্‌রান ছিলে, কিন্তু তোমার পরে তারা কী করেছে তা তোমার জানা নেই। অতএব রাত-দিন হুযূর (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করবে। তিনি (সঃ) ধর্মের মাঝেও রহমত এবং সকল জাতির জন্য রহমত ছিলেন। সকলের জন্য শিফা, (আরোগ্যদাতা) ছিলেন। দোয়া করবেন - সকল মানুষে আল্লাহ্ যেন তাঁর (সঃ) শিফার মু'জিযা (নিদর্শন) দেখান। রোগাক্রান্তদেরকেও এবং যারা তাদের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকেও। প্রতিদিন অনেক পত্র পেয়ে থাকি, খবর পাই, অনেক রুগী এমন যাদেরকে Teminal Patient বলা হয়, অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থা, শেষ অবস্থা। কিন্তু অনেক সময় এমন রুগীও আল্লাহ্‌র ফযলে সুস্থ হয়ে উঠে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এমন মুমূর্ষু রুগীকে শাফায়াত (সুপারিশ) করে রোগমুক্ত করার সুযোগ পেয়েছেন। এমন রুগীর সম্পর্কে ডাক্তার বলেছিলেন, এর বাঁচার সুযোগ নেই। কিন্তু শাফায়াতের যখন সুযোগ হোল তখন তারা রোগমুক্ত হয়ে গেল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইমাম ছিলেন, মালিক ছিলেন, সুতরাং আঁ হযরত (সঃ)-এর শাফায়াত ক্ষমতাই মূলতঃ অন্যদের দোয়ার শিফার মাঝে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আঁ হযরত (সঃ)-এর শাফায়াত ক্রিয়াশীল থাকবে। এজন্য দোয়া করা উচিত। আমরাও যেন আঁ হযরত (সঃ)-এর শিফার প্রতিফলন লাভ

করি। আমরা যেন হুযূর (সঃ)-এর শিফার যোগ্য বলে বিবেচিত হই। আল্লাহ্ আমাদের সেই সৌভাগ্য দান করুন।

এবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করছি। হযরত নবী করীম (সঃ)-এর আনুগত্যের বরকতে (অর্থাৎ দাসত্বের সুবাদে) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও শাফায়াত ও রহমতের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রা'ফত কেবল মু'মিনদের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু রহমত সবার জন্য প্রযোজ্য।

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব অনেক আহমদীর নামে নিজ পত্রিকা পাঠাতেন। তিনি হযরত (আঃ)-এর কঠোর বিরোধী বার বার মিথ্যাবাদী ও কাফির বলে প্রচার করতেন। সেই আহমদীরা তার পত্রিকার গ্রাহক হতে চাইতেন না। কিন্তু মৌলভী সাহেব নিজ থেকে পত্রিকা পাঠাতেন এবং বিলও পাঠিয়ে দিতেন। কোন আহমদী যদি টাকা না পাঠাতেন তবে মৌলভী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (সঃ)-এর খেদমতে অভিযোগ করতেন যে, অমুক আহমদী পত্রিকার বিলের টাকা দেয় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাদের লিখে পাঠাতেন, তোমরা মৌলভীর পত্রিকার বিলের টাকা দিয়ে দিবে বরং অনুগ্রহ করে কিছু বেশিই দিবে। দেখুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) শত্রুদের জন্যও রহমত ছিলেন।

মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী (রাঃ) -এর-লেখা বই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনীতে লিখেছেন,

একবার হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম'-এর আরবী অংশ লিখছিলেন। এর থেকে দু'টি বড় পৃষ্ঠা হযরত সাহেব হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কাছে ফার্সীতে অনুবাদ করে পাঠাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে সে পৃষ্ঠাগুলো কোথাও হারিয়ে যায়। মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব খুবই দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন, এখন কী করি? হুযূর (আঃ) কী বলবেন? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খবর পেয়ে মৌলভী সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখুন, এতে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। এটা কোন ব্যাপারই নয়। আল্লাহ্ আমাকে সব চেয়ে আরো ভাল লেখার তৌফীক (যোগ্যতা) দিবেন। অতএব হযরত আকদস (আঃ) নিজেদের জন্যও রহমত ছিলেন আর কুরআনে আছে আঁ হযরত (সঃ) -এর সম্পর্কে **ওয়া বিল মু'মিনীনা রউফুর রহীম**। মু'মিনদের জন্য হুযূর (সঃ) রহমত ছিলেন। (সূরা তওবা ঃ ১২৮)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বরং হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কাছে সমবেদনা প্রকাশ করলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন যে, সেই পৃষ্ঠাগুলো হারানোতে মৌলভী সাহেব খুব মনঃকষ্ট পেয়েছেন। বললেন, 'আপনার কষ্ট পাওয়া আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।"

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি। "মানুষের মাঝে উত্তম মানুষ সে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিলীন করে দেয়। নিজকে বিক্রি করে দেয়। এর বদলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ক্রয় করে নেয়। এসব লোকের উপরই আল্লাহ্র রহমত হয়ে থাকে। যে আল্লাহ্র জন্য নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে সে ব্যক্তি এমনই যে আধ্যাত্মিক অবস্থায় পৌছে গেছে। আল্লাহ্তাআলা এ আয়াতে বলেছেন- সে ব্যক্তি সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় যে আমার পথে আমার সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয় এবং অত্যন্ত আত্ম - বিলীনতার সাথে সকল কাজ-কর্মের মাধ্যমে নিজের অবস্থাকে প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত প্রাণ বান্দা। নিজেকে, নিজের আপাদমস্তক সবকিছুকে সম্পূর্ণভাবে এমন বস্তুর মত ক'রে তুলে ধরে যেন তার সবকিছুই তার সৃষ্টিকর্তার সেবার জন্য এবং তাঁর সৃষ্টির সেবার জন্যই বানানো হয়েছে। তারপর তার সমস্ত পুণ্যকর্ম তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এমনভাবে এমন আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করে যে, সে যেমন তার আনুগত্যের আয়নার মাঝে তার প্রিয় স্রষ্টাকে দেখতে পাচ্ছে"। তার প্রত্যেক শক্তি, তার হৃদয়ের শক্তি, তার মেধাশক্তি, তার দৈহিক শক্তি, তার হাত-পায়ের শক্তি, তার সমস্ত শক্তি সে আল্লাহ্র রাস্তায় এমনভাবে নিয়োজিত করে দেয় যেমন বলদ গরু ইত্যাদিকে হালের জোয়ালের নীচে জুতে দেয়া হয়। "এবং তার সমস্ত আনন্দ তাঁর আনুগত্যের মাঝে সে অনুভব করে।" অন্যান্য আনন্দদায়ক দ্রব্যাদির মাঝে যেমন সে আনন্দ ও তৃপ্তি বোধ করে, তেমনই আল্লাহ্র আনুগত্যের মাঝেও সে সমস্ত আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করে। "এবং সমস্ত পুণ্যকর্মে সে কোন প্রকার পরিশ্রম বা কষ্ট বোধ করে না বরং বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দের অনুভূতি নিয়ে সে তা সম্পাদন করতে শুরু করে।" সৎকর্ম সম্পাদনে সে কোন পরিশ্রম বা ক্লান্তি বোধ করে না বরং সেখান থেকে সে আনন্দবোধ ও তৃপ্তি অনুভব করে। আমাদের আনন্দ আমাদের খোদার মাঝেই আমরা পাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্যত্র বলেছেন, "এবং সেই বেহেশ্ত যা ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে তা আসলে এরই প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব যাকে আমাদের খোদাতাআলার শক্তির দ্বারা বাস্তব আকারে দেখানো হবে।"

(ইসলামী উসুল কি ফিলাসফি; রূহানী খাযায়েন, ১০ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৫)

এখানে বেহেশ্ত সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলোরও অপনোদন করা হয়েছে যে, তা কী জিনিস। ইহ জীবনে আল্লাহ্র দরুন যে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হয় - সেই আনন্দই পরকালে জান্নাতি বা বেহেশতের আকার ধারণ করবে। এটি কী বিষয়? এ তো খুবই সূক্ষ্ম বিষয়, খুবই চিকণ বিষয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, এমনটিই হবে। এ জীবনে আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ) করে মজা পায় যে ব্যক্তি, সে ব্যক্তি পরকালের জীবনেও আল্লাহ্র যিক্র করে মজা পাবে। সেখানে আল্লাহ্র নৈকট্যের কারণে আরো বেশি মজা পাবে। আল্লাহ্ আমাদিগকে তৌফীক দিন যেন আমরা এসব বিষয়ে কৃতকার্য হতে পারি, নেক আমল করে যেতে পারি।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন-এর ২৪ জানুয়ারী, ২০০৩ইং তারিখের সংখ্যা থেকে অনূদিত)

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ্‌র 'রউফ' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৩ ডিসেম্বর, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহেঃ) সূরা আল্ বাকারার ১৪৪ আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা আরম্ভ করেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদ ঃ "এবং এভাবেই আমরা তোমাদেরকে এক উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি যেন তোমরা সমগ্র মানবমন্ডলীর উপর তত্ত্বাবধায়ক হও। এবং এ রসূল তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হয়। এবং সেই কিবলাকে যার উপর তুমি ইতোপূর্বে ছিলে, আমরা কেবল এজন্য নির্ধারণ করেছিলাম যেন এ রসূলকে যে অনুসরণ করে তাকে সেই সকল লোকদের থেকে (পৃথক করে) জেনে নেই যারা নিজেদের গোড়ালিতে (পূর্বাবস্থায়)ফিরে যায়। এবং যাদেরকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়েছেন তারা ছাড়া অন্যদের জন্য এটা অবশ্যই কঠিন। আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানবমন্ডলীর প্রতি অতি মমতাশীল, পরম দয়াময়।"

আজ থেকে আল্লাহ্তাআলার সিফত 'রউফ'-এর বিবরণ আরম্ভ হবে। 'রউফ'-শব্দ রাফত থেকে বেরিয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ প্রথমে বলছি। হযরত ইমাম রাগের (রহঃ) নিজ কিতাব 'মুফরাদাত ফী গারীবুল কুরআন' এ লিখেছেন, রাফত অর্থ রহমত। যখন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি রাফতপূর্ণ ব্যবহার করেছে, এর অর্থ হয় সে রউফ (রাফতকারী) হয়েছে। অর্থাৎ সে দয়া করেছে। কুরআন শরীফে আছে; **লাতাখ্যুকুম বিহিমা রা'ফাতুন ফী দীনিল্লাহ্** আল্লাহ্‌র ধর্মের ব্যাপারে তোমাকে নম্রতা না পেয়ে বসে। (অর্থাৎ ধর্মের বিধান পালন করা আবশ্যক এতে কোন প্রকার গাফিলতির সুযোগ নেই - অনুবাদক)।

তাজুল উরুস এ লিখেছেন, 'রউফ সবুর এর ওজনে এবং আল্লাহ্ পবিত্র নামগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

মুনজিদ-এ লিখেছে- রাফত এর অর্থ এমন দয়া যা চূড়ান্ত ও চরম পর্যায়ের দয়া যার মাঝে দান ও ক্ষমাশীলতাও রয়েছে। যখন বলা হয়, 'রউফ, পিতা- তখন অর্থ হয় অত্যন্ত বেশি রহমত বা দয়ালু পিতা। 'রউফ বিচারক' অর্থ এমন বিচারক যিনি শাস্তি প্রদানে কঠোরতা প্রদর্শন করেন না (মুনজিদ)।

লিসানুল আরবে লিখেছেন, 'রাফত অর্থ রহমত (অনুকম্পা), আরো বলা হয়েছে যে, এর অর্থ প্রচন্ড রহমত দুর্বার রহমত। ... রাফ'ত মূলতঃ রহমতের সাথেই সংযুক্ত।

'আন্‌নেহায়া ফী গরীবেল হাদীস-এর প্রণেতা আল্লামা ইবনে আছীর লিখেছেন, 'রউফ আল্লাহ্‌র নামের মাঝে একটি। এর অর্থ এই, তিনি নিজ বান্দাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ করুণা প্রদর্শনকারী এবং নিজ অনুগ্রহ ও দয়ার গুণে বান্দাদের প্রতি কৃপা করেন। রাফত রহমতের চেয়েও বেশি গভীর। এমন হওয়া অসম্ভব যে কোন অপসন্দনীয় ও অপ্রিয় ক্ষেত্রে রাফতের প্রয়োগ হয়। কিন্তু এমন হতেও পারে যে, কোন বিশেষ কারণে কোন অপ্রিয় ক্ষেত্রেও রহমতের ব্যবহার হবে।

হযরত বরয়া বিন আযেব (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছে, আঁ হযরত (সঃ) প্রথম যুগে ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাস এর দিকে কিবলা করে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু পসন্দ করতেন যেন কিবলা কাবা শরীফের দিকেই হয়। একবার আঁ হযরত (সঃ) এক নামায, হয়ত আসরের নামায ছিল, আদায় করলেন, অনেক মানুষ হুযূর (সঃ)-এর সাথে নামায আদায় করেছিল। হুযূর (সঃ)-এর সাথে নামায পড়ে একজন বেরিয়ে ছিল। সে ব্যক্তি একটি মসজিদের পাশে দিয়ে যেতে যেতে দেখলো যে সেখানে এক জামাতের নামায হচ্ছে এবং তারা রুকূ' অবস্থায় আছে। এ ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর পেছনে মক্কার দিকে কিবলা করে নামায পড়ে আসছি। এ ব্যক্তির কথা শুনে সেই জামাতের সবাই এ অবস্থাতেই নিজেদের কিবলা মক্কার দিকে ঘুরিয়ে নিল। আমরা জানতাম না যে, কিবলা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে যারা মারা গেছেন বা শহীদ হয়ে গেছেন তাদের ব্যাপারে কী ধারণা করব। তারপর দেখলাম, আয়াত নাযেল হয়েছে, **ওয়া মা কানাল্লাহু লিইউযীয়ু ঈমানাকুম ইন্নাল্লাহা বিন্নাসি লা রউফুর রহীম** (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

কল্যাণমন্ডিত এ উম্মতের জন্য কুরআন শরীফে 'মধ্যপন্থার' নির্দেশ রয়েছে। তওরাতে আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইঞ্জীলে ক্ষমা ও দয়ার প্রতি বেশি বেশি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ উম্মত (মুহাম্মাদীয়া)-কে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, মধ্যপন্থী হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, **কাযালিকা জায়নলাকুম উম্মাতান ওসাতান** (অর্থ ঃ এভাবে আমরা তোমাদেরকে উত্তম জাতি, মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি (বাকারা ঃ ১৪৪)। অর্থাৎ আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থার ওপর চলাচলকারী বানিয়েছি এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছি। সুতরাং তার জন্য মোবারকবাদ (ধন্যবাদ) যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। (হাদীসে আছে) "খায়রুল উমুরি আউসাতুহা" অর্থ ঃ যে কোন কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বনই উত্তম রিপোর্ট(জলসা আযম মজাহেব পৃঃ ১২৬)।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ১৭ই জানুয়ারী ২০০৩ইং অনুসরণে)

অনুবাদ - **মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
- মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (রাহেঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(৩১-১২-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেন মাওলানা ফিরোজ আলম)

প্রশ্ন নং ১ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা মুহাম্মদ-এর ৩ আয়াতে আছে অর্থাৎ, "এবং যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আর যা মুহাম্মাদের উপর নাযেল করা হয়েছে এর ওপরও ঈমান আনে বস্তুতঃ এটা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য-তিনি তাদের অনিষ্টতাকে দূরীভূত করে দিবেন এবং তাদের অবস্থার সংশোধন করে দিবেন।" প্রশ্ন হচ্ছে, আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তো অত্যন্ত খারাপ। এর কারণ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আঁ হযরত (সঃ)-এর ওপর যারা ঈমান আনে ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার দাবী করবে-এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয় নি। আজকাল সাধারণ মুসলমান ও অ-আহমদী মৌলভীরা মুখে মুসলমান হওয়ার দাবী করেন কিন্তু আসলে ওরা মুসলমানের মত ঈমান রাখেন না এবং প্রকৃত ইসলামের উপর আমলও করেন না তাই তারা বিপদে আছেন ও সব জায়গাই লাঞ্ছিত হচ্ছেন। খাঁটি মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার অবশ্যই পূর্ণ হবে। সত্যিকার ঈমান হলো এ আয়াতের শর্ত। সত্যিকার ঈমানদারদের মাঝে কিছু দুর্বলতা থাকলেও আল্লাহ্‌তাআলা তা ক্ষমা করে দিবেন।

প্রশ্ন নং ২ ঃ আমাদেরতো দৃঢ়-বিশ্বাস রয়েছে যে, হোমিওপ্যাথি ঔষধ কার্যকরী। কিন্তু গত নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখে লন্ডন-এর সংবাদপত্রে এবং ২৮ তারিখে বিবিসি-তে এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছিল যে, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, হোমিওপ্যাথি একটি কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি তো সেই লোককে এক মিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। হুযূর এ বিষয়ে মন্তব্য করবেন কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আমি এ ব্যক্তির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। আপনিও আমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। শুধু মানুষের ওপরেই হোমিও ঔষধ কাজ করে না গরু-মইষের ওপরও কাজ করে থাকে। এর প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। এইড্‌স-এর চিকিৎসা এলোপ্যাথিতে নেই। কিন্তু হোমিও প্যাথিতে ১ লাখ শক্তির সাইলেসিয়া ব্যবহার করা হয়েছে আর এতে রোগী নিরাময় লাভ করেছে। আমেরিকাতে আমাদের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আফতাব সাহেব তাঁর এক হিন্দু বন্ধুর ছেলের প্রসঙ্গে যাকে ডাক্তার বিদায় দিয়ে দিয়েছেন, তিনি হুযূর (রাহেঃ)-এর কাছে লিখলে, হুযূর (রাহেঃ) তাকে সাইলেসিয়া ব্যবস্থা দেন। ২/৩ মাস ধরে কোন খবর নেই। পরে হুযূর (রাহেঃ)-এর পক্ষ থেকে জানতে চাইলে জানানো হয় যে, এ ঔষধ খেয়ে সে পুরোপুরি সুস্থ।

হুযূর জনাব আব্দুল হাদীকে বলেন, আপনি আমার পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ দিন। আপনি তো এক মিলিয়ন পাবেন। এথেকে কিন্তু শওকতকেও দিবেন।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ২৩ আয়াতে আছে ঃ "এবং তোমাদের মাঝে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম্ না খায় যে, তারা তাদের আত্মীয় স্বজনকে এবং মিস্‌কীনগণকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদিগকে সাহায্য দান করবে না। তারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।" এ আয়াতে ফযল শব্দ দ্বারা কি টাকা-পয়সা ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও শক্তিকেও বুঝানো হয়েছে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য ছাড়াও মর্তবা-মকাম ইত্যাদি সব বুঝায়। **যালিকা ফাযলুল্লাহি ইউতিহি মাঁইশাও**-এখানে নবুওয়তকেও ফযল বলা হয়েছে।

আসলে যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হয়েছিল এ ব্যাপারে দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন এক লোকও জড়িয়ে পড়েছিল যাকে হযরত আবূ বকর আর্থিক সাহায্য দিতেন। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আবূবকরকে হুকুম দেন তিনি যেন সেই বোকা মুসলমানকে সাহায্য দেয়া বন্ধ না করেন।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ) যখন কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করলেন তিনি তখনই জানতেন যে, তিনি কাবুল ফিরে গেলে তাঁকে মেরে ফেলা হবে। তিনি কি জেনে-শুনেই জীবনের প্রতি হুমকিকে বেছে নিলেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, তিনি জানতেন যে, তার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে কষ্ট দিবে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর অনেক অনুসারী আহমদীয়ত গ্রহণ করবেন। তিনি তবলীগ করার জন্যে কাবুল গেলেন। এবং যদিও তাঁকে শহীদ করা হ'ল কিন্তু তাঁর তবলীগে আফগানিস্তানে সত্যি সত্যিই তাঁর অনেক অনুসারী আহমদী হয়েছিল।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ যদি কোন নামাযী সূরা ফাতিহার 'রব্ব' শব্দের চিন্তা করতে থাকেন এবং ইমাম রুকূতে চলে যায় সেক্ষেত্রে নামাযীর নামায সম্পর্কে কিছু বলুন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা ঠিক নয়। প্রত্যেক নামাযীর নামাযে সূরা ফাতিহা পুরাপুরি পড়া উচিত। তাই তার নামায ঠিক হবে, না পুনরায় পড়তে হবে।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর বই "বরাহীনে আহমদীয়া"তে লিখেছেন যে, মহানবী (সঃ) একাই কয়েক হাজার নবীর সমান কাজ করেছেন-এর তাৎপর্য কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ একথা ঠিক যে, হযরত নবী করীম (সঃ) ধর্মের যত সেবা করেছেন সব নবী একত্র হয়েও তা করেন নি। তিনি ইসলামকে সারা পৃথিবীতে বেশি বেশি বিস্তার দিয়েছেন এবং কুরবানী করেছেন। এ প্রসঙ্গে এক ইংরেজ লেখকও এভাবে তাঁর বই "Hero as a prophet" -এ লিখেছেন যে মহানবী যে বিরাট ধর্মীয় কাজ করে গেছেন অন্য কোন ব্যক্তি তত বড় কাজ কোন নবী করে নি!

প্রশ্ন নং ৭ ঃ স্থানীয় একটি বাংলা সাপ্তাহিকীতে গত সংখ্যায় জনৈক মুহাম্মদ তৈয়্যব হুসায়েন

লিখেছেন- নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সঃ) নামটি হাব্‌হুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র রজ্জ। ইতিহাস সাক্ষ্য, যতদিন আমরা তাঁকে নিষ্ঠার সঙ্গে দৃঢ়-চিত্তে ধারণ করেছিলাম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের বাগডোর আমাদের হাতে ছিল। আর যখনই আমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি তখনই আমরা হয়েছি টুকরো টুকরো হয়েছি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন। পরিণত হয়েছি আমরা উশৃঙ্খল জাতিতে। এ আত্মোপলব্ধির পরও এ উম্মতের দেউলিয়াত্ব ঘুঁচাবার জন্য কোন মহাপুরুষের আগমনের রাস্তাটাকে অস্বীকারের কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটাই তো আমাদের বোকামী। এটাই তো নিয়ম, অতীতেও যখন কেউ এসেছে তখন তাকে মানা করা হয় নি। হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর জীবনকে দেখুন। তাঁর (সঃ) জীবন তারা দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তের বছর পর্যন্ত তাঁর (সঃ) চরম বিরোধিতা হয়েছে মক্কাতে। এর পর মুহাম্মদ (সঃ)-এর জামাল (প্রতাপ) ও জালাল সৌন্দর্য পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয়ে তা প্রভাব বিস্তার করেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র মকাম ও মর্যাদা হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর মত ছিলো না যদিও তিনি প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। তাঁর (আঃ) বিরোধিতাও হওয়ার ছিলো। এ তুলনাটা এমন যে চন্দ্র সূর্যের আলো নিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে। অনুরূপভাবে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর পবিত্র নূর থেকে নূর নিয়ে এ পৃথিবীতে আলোকিত করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে তিনি এসেছেন। তাঁর (আঃ) বিরোধিতা হওয়ার ছিল। এটাই প্রচলিত রীতি, যা চলে আসছে এবং অব্যাহত আছে।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ পবিত্র খানা কা'বা কেন কালো কাপড়ে ঢাকা থাকে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ কালো কাপড় মহানবী (সঃ)-এর জন্মের পূর্ব থেকেই কা'বা গৃহের উপর চড়ানোর নিয়ম চলে আসছে। এ গেলাফের প্রয়োজন কা'বা গৃহকে ধূলা-বালি থেকে রক্ষা করা। এর মধ্যে আর কোন গুঢ় রহস্য নেই।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ কিছু লোক বলে, প্রকৃতি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছে। পৃথক কোন স্রষ্টা নেই। তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য কী করা যেতে পারে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এ ধরনের লোকদের জিজ্ঞেস করা উচিত যে, প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করল? আল্লাহ্‌তাআলাই প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন ও তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বানিয়েছেন। **ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরয**- আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনি প্রকৃতিকে সৃষ্টি না করলে কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ কেউ যদি সন্দেহ করে, অন্য কারও কুদৃষ্টি তার ক্ষতি করতে পারে তাহলে তার কীভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, কুদৃষ্টি বলে একটি জিনিষ আছে যাতে কারও কারও ক্ষতিও হয়ে থাকে কিন্তু এটা একটি কঠিন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মনোবল বা বিশ্বাস জোরদার করা উচিত যে, তার কুদৃষ্টি আমার ওপর পড়তে দিও না। এটি এক ধরনের মিসম্যারিজম।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ তাক্‌ওয়া এবং অল্প খাওয়া এ দু'য়ের মাঝে কোন সম্পর্ক আছে কিনা?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কম খেতেন। তিনি নিজের খাবার কিছু গরীব লোকদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন এবং অনেক সময় অল্প খেয়ে থাকতেন। আমরা তো মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মত কঠোরতা নিজেদের উপর করতে পারি না কিন্তু যখন আমরা রোযা রাখি তো সত্যি সত্যিই আধ্যাত্মিকভাবে ভাল ফল পেয়ে থাকি।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ হুযূর টুপি না পরলে নামায হবে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ নামায তো হবে কিন্তু তবুও আমি বলবো, নামায পড়ার সময় অবশ্যই টুপি পরা উচিত।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ হুযূর আল্লাহ্‌তাআলার নূর-এর অর্থ কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ নূর এর অর্থ হচ্ছে আলো এবং আল্লাহ্ হলেন প্রথম নূর। তাঁর নূরের ফলে বাকী সব আলোকিত হয়েছে।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ মহানবী (সঃ) কী ধরনের কাপড় পরতেন?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ মহানবী (সঃ) সাধারণ কাপড় পড়তেন তবে মাঝে মাঝে যখন কেউ দামী ও সুন্দর কাপড় উপহার দিত তখন তা-ও পরতেন। তাঁর (সঃ) মাঝে কোন কৃত্রিমতা ছিল না।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য কোন্ দোয়া কুরআনে আছে কি?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট নিজের ভাষায় দোয়া করবেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে কুদৃষ্টির প্রভাব থেকে সব সময় রক্ষা কর'।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ পবিত্র কুরআনে আমাদিগকে শেখানো হয়েছে, আমরা যাতে দোয়া করি আমার প্রভু! আমার পিতা-মাতার প্রতি সেভাবে করুণা কর যেভাবে তাঁরা শৈশবে আমাদের লালন-পালন করেছিলেন। তবে কারও পিতা - মাতা যদি জন্মের পরই মারা যায় তাহলে তার ক্ষেত্রে এ দোয়ার তাৎপর্য কী হবে?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা সেসব শিশুর ওপরে প্রযোজ্য যাদের পিতা-মাতা তাদেরকে শৈশবে লালন পালন করেছে। এটি এ ধরনের শিশুর জন্য প্রযোজ্য নয়।

এ পর্যায়ে শওকত একটি নযম শুনায়।

সংকলন ও অনুবাদ - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

বেনীন ভুখন্ডে আফ্রিকার ইতিহাস সৃষ্টিকারী ১৮তম সালানা জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণীর জাঁকজমকপূর্ণ প্রকাশ।

* ..... কঙ্গআফ পরাকাও-এর নেতৃত্বে দেশের বড় বড় বাদশাহ্‌দের ৩০ জনের একটি প্রতিনিধিদল ঘোড়ায় আরোহণ করে জলসায় উপস্থিত হলে পরিবেশ **আল্লাহু আকবর** ধ্বনিতে মুখরিত হলো। ... পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে আরও ৭০ জন অধীনস্থ বাদশাহদের অংশ গ্রহণের সাথে সাথে নাইজারের সবচে' বড় বাদশাহ্ সুলতান অব আগাদীস-এর ১২ জনের একটি দল ২৫০০ কিলোমিটার সফর করে জলসায় উপস্থিত হন। ... ৫০ হাজারের অতিরিক্ত আহমদী বন্ধুদের অংশগ্রহণ। ... ন্যাশনাল টিভি, দেশের রেডিও স্টেশন ও ২০টি পত্রিকার সাংবাদিকগণের একটি বড় দল কমপক্ষে ৪দিন পর্যন্ত রিপোর্টিং করার জন্যে জলসা গাহে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২১শে ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখ (TOUI) তাওই গ্রামে এ জলসা অনুষ্ঠিত হয় (সংক্ষিপ্তসার)

- নির্বাহী সম্পাদক

মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'

সূচনা

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উপমহাদেশের বৃটিশ-বিরোধী সেনা-অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এবং তা ঘটেছিল প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ মুসলিম অসন্তোষের কারণে। এই অভ্যুত্থানকে কেউ কেউ বলেন সিপাহী-বিদ্রোহ, আবার কেউবা বলেন সিপাহী বিপ্লব। শাসন-কর্তৃত্ব যদি বৈধ হয় তবে, তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকে বলা হয় 'বিদ্রোহ'। এই ধরনের বিদ্রোহ বা বাগাওত ইসলামের দৃষ্টিতে না-জায়েয। পক্ষান্তরে, শাসন-কর্তৃত্ব যদি বৈধ না হয়, জবরদস্তিমূলক হয়, তবে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত অভ্যুত্থানকে বলা যেতে পারে বিপ্লব। মুসলিম ইতিহাসে দেখা গেছে যে, যে দেশে খলীফা বা উলীল আমরের প্রত্যক্ষ শাসন ছিল না, সেই দেশের শাসককে তা তিনি আমীর, সুলতান কিংবা বাদশাহ্ যে-ই হোন না কেন তাঁর শাসন কর্তৃত্বের বৈধতা সপ্রমাণিত করার জন্য সমসাময়িক 'খলীফাতুল মুসলেমীন'- এর স্বীকৃতি ও সনদ গ্রহণ করতে হতো। নইলে, প্রজাসাধারণ সেই শাসকের প্রতি তাদের আনুগত্য স্বীকারে রাজি হতো না। মুসলিম গণমানসের এই ধর্মীয় চেতনাটার গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল বৃটিশরাও তাই বিপ্লবের সময় নির্বিবাদে গণহত্যা চালিয়ে রাজধানী দিল্লীকে প্রায় মুসলিম জনশূন্য করেও মুসলিম গণমানসের আনুগত্য আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই দেখা গেছে যে, বৃটিশরা তাদের ভারত শাসনকে বৈধতা দানের জন্য ১৮৫৭ এর সেই বিপ্লব চলাকালীন এক সময়ে তদানীন্তন তুরস্ক সুলতান প্রথম আব্দুল মজীদের নিকট থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ করেছিল। বলা বাহুল্য তুর্কী সুলতান বা পাদিশাহ্‌কেই তৎকালীন মুসলিম জাহানে খলীফাতুল মুসলেমীন বা আমীরুল মু'মিনীনরূপে মান্য করা হতো। খলীফার স্বীকৃতি লাভের পর বৃটিশ রাজ, বোধ করি, স্বস্তি অনুভব করেছিল এই ভেবে যে, তারা ভারত শাসনের পক্ষে বৈধতা পেয়ে গেছে। বাস্তবেও দেখা গেছে যে, যে মুসলমানরা ১৭৫৭ থেকে, বরং ১৭০৭ সকাল থেকেই, ১৮৫৭খৃঃ পর্যন্ত পুরো দেড় শতাব্দী কাল ধরে বৃটিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, তারা তাদের সেই অস্ত্রের সংগ্রামে ক্ষান্ত দিয়েছে। অতঃপর শুরু হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক বা শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন। যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আযাদী অর্জনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্টে।

খলীফার সেই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বৃটিশ শাসন তিরোহিত হয়ে গেলে পরে. হিন্দু ভারতের জন্য মুসলিম খলীফার স্বীকৃতির প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু মুসলিম পাকিস্তানের জন্যেও তো খলীফাতুল মুসলেমীনের স্বীকৃতির প্রশ্ন ওঠে নি। কেননা, তথা ইসলামী বিশ্বের মাথার উপরে কোন 'খিলাফত' ছিল না, কেউ 'আমীরুল মু'মিনীন' ছিলেন না। খিলাফত এর তেইশ বছর পূর্বেই অবলুপ্ত ঘোষিত হয়েছিল। বরং গ্রাহ্যতা হারিয়েছিল ৪০ বছর পূর্বেই।

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, খিলাফতে ইসলামীয়া-এর স্বীকৃতি ও সমর্থন ছাড়া কোন মুসলিম দেশকে বা কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে শাসন করাটা কখনই বৈধতা পায় নি। এবং এরূপ বৈধতাবিহীন শাসন-কর্তৃত্বকে কচিৎ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কখনই মান্য করে নি, কখনই সেই শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নি। এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। আর এই ঐতিহাসিক সত্যটাই ফুটে ওঠেছিল আরও একবার, যখন ভারতবর্ষ শাসন করতে একে বৃটিশ রাজকেও বাধ্য হয়ে স্বীকৃতি গ্রহণ করতে হয়েছিল 'খলীফাতুল মুসলেমীন'-এর কাছ থেকে। এই সত্যটার অন্তর্নিহিত মর্ম হচ্ছে এই যে, খলীফাতুল মুসলেমীনের স্বীকৃতি ও সমর্থন ব্যতীত মুসলিম গণশাসনের উপরে শাসন পরিচালনা বৈধতা পায় না। এবং এই অর্থে, আজকের দুনিয়ার মুসলিম দেশগুলির শাসনকর্তৃত্ব বৈধ কিনা, তা বিবেচনার দাবী রাখে। কিন্তু, এ কথাটাও তো সত্য যে, মুসলিম বিশ্বের মাথার উপরে বর্তমান যামানায় কোন খলীফা নেই, খিলাফত নেই। কিন্তু নেই কেন? মুসলিম উম্মাহ্ তো কখনই নেতাহীন বা ইমামহীন অবস্থায় থাকার কথা নয়?

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটার জবাব আমরা জানতে চাই। আমরা জানতে চাই কেনই বা এই অবস্থিত শূন্যতার সৃষ্টি হলো মুসলিম উম্মাহ্‌র সামনে। কেনই বা এর মাথার উপরে আজ কুরআন করীমের নির্দেশিত সেই অপরিহার্য ও অবশ্যমান্য 'উলীল আমর' নেই। এই সব প্রশ্নের সমাধান খোঁজার প্রেক্ষাপটে আমরা এবার দৃষ্টি দিতে চাই, 'খিলাফত'-এর প্রতি মুসলিম গণমানসের যে আকর্ষণ ও আনুগত্য তার প্রতি এবং মুসলিম গণমাধ্যমের ওপরে খিলাফতের যে গভীর সুদূরপ্রসারী অনিবার্য প্রভাব, এর প্রতি। এবং সেই সঙ্গে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও ঐতিহ্যের ধারার প্রতি। কোন দেশ বা জাতির শাসন কর্তৃত্বের জন্য শাসকের দিক থেকে যেসব প্রধানতঃ প্রয়োজন ঃ সুবিচার, সমতা ও সদাচরণ তেমনি শাসিতের দিক থেকেও বিশেষ প্রয়োজন ঃ আনুগত্য ও আবেগসম্ভূত সমর্থন বা আইনানুগ আচরণ। এই সাথে উভয়পক্ষে প্রয়োজন ঃ দেশ-প্রেম ও মানবপ্রেম। কোন শাসন কর্তৃত্বের প্রতি যদি শাসিতের কোন নির্দোষ আবেগসম্ভূত সমর্থন না থাকে, তবে সেই কর্তৃপক্ষের শাসন যদি যোগ্য ও সুষ্ঠু হয়ও, তথাপি এর সাফল্য ক্ষণস্থায়ী বা পরিত্যক্ত হতে বাধ্য। বরং সেইরূপ কর্তৃপক্ষকে অধিকার হরণকারী বা usurper বলে ধিকৃত করা হয়। হৃদয়ে এইরূপ আবেগানুভূতির প্রকার তিনটি ঃ ১. ধর্মীয়, ২. জাতীয় (ভৌগলিক ও গোত্রীয়) ৩. উত্তরাধিকার সূত্রীয়। ধর্মীয় আবেগ আবার দুই আবেগকে অতিক্রম করে যায়। তবে এসব আবেগানুভূতি সূক্ষ্ম হয়ে উঠে, যখন শাসন কর্তৃত্ব হয় জবরদস্তিমূলক, আত্মকেন্দ্রিক ও অবিচারী। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, জাতীয় বা দেশপ্রেমের আবেগ না থাকলে নেতৃত্ব গড়ে উঠে না বা টিকে থাকে না। এমনকি, এক্ষেত্রেও নেতার উত্তরাধিকারের উদ্ভব ঘটে, কিন্তু সে-ও সেই আবেগের কারণে।

'ইসলামী খিলাফত'-এর প্রতি জনগণের যে আনুগত্য ও সমর্থন ছিল, তা ছিল মূলতঃ ধর্মীয় আবেগপ্রসূত। তাই, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি যে আবেগ তা তখন অতিক্রান্ত হয়েছিল। অন্যথায়, মক্কা-মদীনা এবং কুফা ও দামেস্ক থেকে সুদূরে খোরাসানে ভিন্ন জাতিসত্তা এবং ভিন্ন ভাষা ও কৃষ্টির জনগণের মাঝে খিলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না, কর্দোভায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না, কন্‌স্টান্টিনোপলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। কায়রোতেও 'ইমামত' বা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। এই ধর্মীয় আবেগের জন্যই অতীতে বড় বড় রাজা বাদশাহ্‌দেরকেও খলীফার স্বীকৃতি গ্রহণ করতে হতো। অন্যথায়, তাদের পক্ষে শাসনক্ষমতা চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো না। এবং খলীফার স্বীকৃতি ও সনদ না পাওয়া পর্যন্ত কোন শাসন কর্তৃত্বই প্রজাসাধারণের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো না। খলীফার

স্বীকৃতি ও সমর্থন ছাড়া কোন রাষ্ট্র ক্ষমতাকেই ইসলামী বলা কিংবা দার-উল্-ইসলামের আওতাভুক্ত মনে করা হতো না। খলীফার স্বীকৃতি প্রাপ্ত হলে সেই দেশের রাজধানী দিল্লী কিংবা গাড়ুয়াতে হলেও তা বাগদাদ কিংবা কুস্তন্তুনিয়ার দার-উল্-খিলাফতের বৃহত্তর বলয়ের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বলে গণ্য করা হতো। কেননা, খলীফাই মুসলিম ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের জন্য 'উলীল আমর' অর্থাৎ আদেশ দানের অধিকারী। এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এই 'উলীল আমর' থাকা একান্ত জরুরী এবং তা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র হুকুম হচ্ছে ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাদেরও (আনুগত্য কর) যারা তোমাদের মাঝে আদেশ দানের অধিকারী" (৪ঃ৬০)।

স্পষ্টতঃই, 'উলীল আমর'- এর প্রতি যে আনুগত্য, তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের অনুবর্তী, তার বাইরে নয়। বাইরের অর্থাৎ অন্য কোন স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের আনুগত্য আবশ্যক। কিন্তু, তা যদি কুরআনী বিধান বা অনুশাসনের পরিপন্থী হয়, তবে তার আনুগত্য বাধ্যকর নয়, এবং তা পরিত্যাজ্য। তাই, কুরআনী বিধানের আওতায় যে খিলাফত চলে আসছিল তার কার্যকারিতায় দুর্বলতা থাকলেও তা ছিল ইসলামী। তাই দেখা গেছে যে, অতীতে খলীফার প্রতি হৃদয়ের টান মাটির টানকে অতিক্রম করে গেছে। মানুষ তো ধর্মের জন্য দেশ ছেড়েছে, কিন্তু দেশের জন্য স্বেচ্ছায় ধর্ম ছাড়ে নি, ছাড়তে বাধ্য হলেও সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে পারে নি। স্পেনে যে মুসলিম বিতাড়ন ও ধর্মান্তরকরণ সম্ভব হয়েছিল, তা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ক্রুর চক্রান্ত এবং অবর্ণনীয় হিংস্র অত্যাচারের কারণে। কামাল পাশারা যে খিলাফতের টান ছিঁড়ে ফেলেছিল, সেজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল ধর্মের নামে অধার্মিকতা। এবং সেই অধার্মিকতার কবল থেকে বাঁচতে গিয়েই তারা খিলাফতের টান ছিন্ন করেছে। কিন্তু, হৃদয়ের ভেতরে যে ধর্মীয় আবেগ, তা ছিন্ন করতে পারে নি, আজও পারছে না। গণতন্ত্রের কথা? কিন্তু, কোথায় কতটা গণতন্ত্র পালিত হচ্ছে। রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের আওতায় গণতন্ত্র, এসবই তো চলছে।

ধর্মীয় আবেগের কারণেই তো গতানুগতিক গণতন্ত্রের ধারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক ধারায় মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যদিও কয়েক শতাব্দী কাল ধরে এই এলাকা মুসলিম এলাকাই ছিল। এবং তা ছিল খিলাফতের ভৌগলিক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত এবং খলীফার ঐহিক ও পারত্রিক ইমামতের এক্তেদায় বা অনুবর্তিতার শামিল। কিন্তু, আজ সেই খেলাফতও নেই, খলীফা-ও নেই। 'সেই উলীল আমর'ও নেই, সেই ইমামতও নেই? কিন্তু নেই কেন? আসলেই কি নেই?

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ মুসলিম শাসন ক্ষমতার বৈধতা। যে বৈধতার হকদার একমাত্র খলীফাতুল মুসলেমীনের। অবস্থান্তরে প্রয়োজন সেই খলীফার স্বীকৃতির ও সমর্থনের। এজন্য শুরুতে আমরা একবার ইসলামের প্রথম যামানার প্রতি দৃকপাত করতে চাই। অতঃপর, পরবর্তী যামানায়। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রিয়তম নবী, প্রেরিত দূত। কোন প্রেরিত রাজা বা বাদশাহ্ ছিলেন না তিনি (সাঃ)। মক্কা বিজয়ের ঠিক প্রাক্কালে যখন প্রতিরোধমুক্ত মুসলিম সেনাবাহিনীগুলো পবিত্র সেই নগরীতে প্রবেশ করছিল একটার পর একটা বিনা রক্তপাতে সুশৃংখলভাবে তখন সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করছিল কিছু দূরে পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে হযরত আব্বাস ও আবূ সুফিয়ান। রসূলে পাক (সঃ)-ও অগ্রসর হচ্ছিলেন তাঁর বাহিনীর সাথে। মহা বিজয়ী সে দিন তিনি। কিন্তু, বিজয়ের গর্বে (তখন) উন্নত ছিল না তাঁর শির, নতশির ছিলেন তিনি; আল্লাহ্‌র প্রতি অতল কৃতজ্ঞতায় শির তাঁর ঝুঁকে পড়ছিল এবং ঘোড়ার পিঠে ঠেকছিল। আবূ সুফিয়ান দেখছিলেন সেই অভাবনীয় দৃশ্য, বললেন ঃ

'আব্বাস! তোমার ভাতিজার চেয়ে কোন শক্তিশালী সম্রাট আজ পৃথিবীতে নেই'।

'তুমি এখনও ভুল করছো, আবূ সুফিয়ান, বললেন, আব্বাস, 'মুহাম্মদ কোন সম্রাট নয়, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র নবী। এবং আব্বাসের (রাঃ) এই কথা সম্পূর্ণ যথার্থ। যথার্থই মুহাম্মদ (সঃ) সঙ্গে করে যা নিয়ে এসেছিলেন তা কোন রাজত্ব বা বাদশাহাত ছিল না, তা ছিল নবুওয়ত-পরিপূর্ণ নবুওয়ত। এই নবুওয়তেরই স্থলাভিষিক্ত যে ঐশী প্রতিষ্ঠান, সেটাই খিলাফত। এবং এই খিলাফতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রসূলে পাক (সঃ)-এর ওফাতের পর ৬৩২ খৃষ্টাব্দে, হিজরী ১১ সনের ১২ই রবিউল আওওয়ালে। এই খেলাফতই ইতিহাসে খিলাফতে রাশেদা বা সত্যনিষ্ঠ খিলাফত হিসেবে আখ্যায়িত। (চলবে)

- শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কাফুরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ডাঃ মোহাম্মদ আছির উদ্দিন গত ০৯/০৪/২০০৩ তারিখ বিকাল ৫.১৫ মিঃ সময় ক্যান্সারজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। স্ত্রী, ৫ মেয়ে ২ ছেলে ও নাতি-নাতনী রেখে যান।

তিনি মেহমান নেওয়াযীতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। জামাতের লোকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম।

তার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

- মোঃ জালাল হোসেন, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কাফুরিয়া

❑ আমার নানা আহমদীয়া মুসলিম জামাত ভাতগাঁর সদস্য জনাব শহীদ মিয়া গত ১/৩/০৩ইং রোজ শনিবার নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৭ বছর।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দশটি পুত্র, ২টি কন্যা, ১৬ জন নাতী, ৯ জন নাতনী সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের পরিবার যেন ধৈর্য ধারণের তৌফীক পায় আর তাঁর মাগফিরাত কামনায় সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার নিবেদন রইল।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

❑ কটিয়াদী জামাতের সদস্য বেতাল গ্রামের সামসুদ্দিন আকন্দ সাহেবের বড় পুত্র আলাউদ্দিন আকন্দ, হার্টের একটি বাল্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর ২৮/৪/২০০৩ইং রোজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা পৌনে আটটায় নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না ... রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। মৃত্যুকালে স্ত্রী তিন ছেলে এক মেয়ে নাতী-নাতনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তার রূহের মাগফেরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

আব্দুর রহমান রানু
মোয়াল্লেম

খিলাফতের মাকাম
ও
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর নির্দেশাবলী

মূল ঃ মৌলভী মোহাম্মদ ইয়ার সাহেব আরেফ, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন মোবাল্লেগ

আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম-প্রবর্তক সারওয়ারে কাওনাইন (উভয় জগতের নেতা) হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ প্রথম হতেই স্পষ্টভাবে যে সকল সংবাদ দিয়েছিলেন সে সকল সংবাদ পূর্ণ করে যথাসময়ে তিনি আবির্ভূত হয়ে সৌভাগ্যশালী বিজয়ী বীরের মত অতি সফলতার সাথে নিজ দায়িত্বাবলী সম্পাদন করে চিরাচরিত নিয়মে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর অনুসারী এবং অনুগামীগণের ব্যাকুলতা এবং দুর্ভাবনা তো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু সে সকল লোক যারা তাঁর জামাতভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের হৃদয়ে ইসলামের জন্য ভালবাসা পোষণ করতেন তাঁরাও ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, সে মহান কাজ যা হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) সম্পাদন করতেন এখন তা কে করবে? সে খোদা যিনি সৈয়্যদনা আঁ হযরত (সঃ)-এর সে মহান (রূহানী) পুত্রকে মহান কাজের জন্য প্রেরণ করেছিলেন প্রথম থেকেই তিনি জানিয়েছিলেন যে, এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্তাআলা খিলাফতের মাধ্যমে জামাতকে নিরাপদ করে দিবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন ঃ দ্বিতীয়তঃ সে সময়ে আল্লাহ্তাআলা তাঁর কুদরত ও মহিমা প্রকাশ করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করতে থাকে, এ বার (নবীর) কার্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে তখন তাদের এ প্রত্যয় হয় যে, এখন এ জামাত ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হবে আর এমন কি জামাতের লোকগণও চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাদের ক'টিদেশ ভেঙ্গে পড়ে। কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতাআলা পুনরায় তাঁর মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে তারা খোদাতাআলার এ 'মু'জিযা' প্রত্যক্ষ করে যেভাবে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হয়েছিলেন।

তিনি পুনরায় এ বিষয়ে বলেছিলেন, "সুতরাং হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্তাআলার এ বিধান রয়েছে যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দু'টি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমতাবস্থায় এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদাতাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করেন। এজন্যে তোমরা আমার এ কথা যা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার ব্যাপারে ইলহাম-(উদ্ধৃতিদাতা)! তাতে চিন্তাকুল হবে না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়, কেননা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক)।

এ ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর দ্বিতীয় কুদরতের প্রথম বিকাশ প্রথম মোহাজির হযরত হাজী হাকিম মৌলভী নূরুদ্দীন রাযিয়াল্লাহুতাআলা আনহুকে এ মহান প্রতিশ্রুত পুরুষের সকল অনুসারীই প্রথম খলীফা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন, "কাদিয়ানে হুযূর (আঃ)-এর জানাযার নামায পড়বার পূর্বেই আল্ ওসীয়্যতের উল্লেখিত তাঁর অন্তিম উপদেশ অনুযায়ী কাদিয়ানে উপস্থিত সদর আঞ্জুমানের মোতামাদগণ ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট আত্মীয়গণের পরামর্শক্রমে এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রাঃ)-এর অনুমোদনক্রমে সমগ্র জামাত যা কাদিয়ানে উপস্থিত ছিল এবং যা সংখ্যায় সে সময় বারশ' ছিল, প্রশংসাভাজন হাজীউল হারমাঈন শরীফাইন জনাব হাকিম নূরুদ্দীন সাহেবকে (সাল্লামাল্লাহুতাআলা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং খলীফা হিসাবে গ্রহণ করল এবং তাঁর হাতে বয়াত করল (১৯০৮ইং সনের বদর পত্রিকার জুন মাসের সংখ্যায় খাজা কামালউদ্দিন সাহেব, সেক্রেটারী সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত ঘোষণা]।

এটা হওয়া প্রয়োজন ছিল। কেননা, ইসলামের দ্বিতীয় বিকাশের জন্যে এটা নির্ধারিত যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য একজন পূর্ণ পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাঁর কার্য পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করবার জন্য তাঁকে সিদ্দীক (রাঃ)-এর মত একজন পুরুষ দেয়া হবে যিনি ইসলামের তরীকে তীরে পৌছানোর জন্যে তাঁর জীবনকালেও এবং মৃত্যুর পরেও নির্ভীক কান্ডারীর ন্যায় সকল বিরোধী তরঙ্গসমূহের সাথে মোকাবেলা করতে থাকবেন। সুতরাং যেভাবে হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) খোদা-প্রদত্ত জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার আলোকে কোন কোন সাহাবার কতিপয় ভাব-ধারণা অশুদ্ধ প্রমাণ করে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে সঠিক পথ নির্ণয় করে দিয়েছিলেন, সেভাবে দ্বিতীয় সিদ্দীক (রাঃ) (আহমদীয়া সিলসিলায় দ্বিতীয় কুদরতের প্রথম বিকাশ)-কেও ভুল ভাবধারাগুলোর মোকাবেলা করতে হয়েছিল। তিনি খুবই স্পষ্টভাবে এবং সাহসিকতার সাথে এগুলোর মূলোৎপাটন করেছিলেন। যখন কতিপয় লোক খিলাফতের মর্যাদা হানি করতে চেষ্টা করেছিল তখন খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

(১) "বলা হয়ে থাকে, খলীফার কাজ কেবল নামায পড়ানো এবং বয়াত গ্রহণ। এ কাজ তো একজন মোল্লার পক্ষেই যথেষ্ট। এর জন্যে কোন খলীফার প্রয়োজন নেই এবং আমি এহেন বয়াতের উপর থু থুও নিক্ষেপ করি না। বয়াত সেই বিষয় যাতে কামিল ইতায়াত (পূর্ব আত্মসমর্পণ) করা হয়ে থাকে এবং খলীফার কোন হুকুমেরই অবাধ্যতা করা হয় না।"

হুযূর (আঃ) কাদিয়ানের মসজিদ মুবারকের সে বক্তৃতার পরে খাজা কামালউদ্দিন সাহেবকে ও মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে দ্বিতীয়বার বয়াত করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

(২) পুনরায় অন্য এক সময় তিনি বলেছিলেনঃ "আমাকে কোন ব্যক্তি বা কোন আঞ্জুমান খলীফা নিযুক্ত করে নি। আমি কোন আঞ্জুমানকে এর যোগ্য মনে করি না যা খলীফা নিযুক্ত করে। আমি আবার বলছি, আমাকে না কোন আঞ্জুমান নিযুক্ত করেছে এবং না আমি এর নিযুক্তির কোন মূল্য দিই। এর পরিত্যাগে আমি থু থু নিক্ষেপও করি না এবং এখন কারও কোন ক্ষমতা নেই যে, আমার নিকট হতে এ খিলাফতের চাদরকে ছিনিয়ে নেয়" (বদর, ৪ঠা জুলাই, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)।

এথেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর নিকট খলীফার নির্বাচন, যে কোন পদ্ধতিতে হউক, প্রকৃতপক্ষে খোদাতাআলা স্বয়ং খলীফা মনোনীত করে থাকেন এবং যে খিলাফত খোদাতাআলার তরফ হতে প্রদান করা হয় একে কোন মানুষ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

(৩) অন্য এক প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছিলেন ঃ "একমাত্র তিনিই (অর্থাৎ খোদাই), না তোমাদের মাঝে কেউ আমাকে খিলাফতের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়েছেন। আমি এর শ্রদ্ধা এবং সম্মান করা আমার অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করি। এ সত্ত্বেও যে, আমি তোমাদের ধন-সম্পদ বা তোমাদের কোন কিছুই গ্রহণ করবার পক্ষপাতি নই। আমার প্রাণের মাঝে এতটুকুও বাসনা নেই যে, কেউ আমাকে সালাম করুক বা না করুক, তোমাদের টাকা-পয়সা যা নযর হিসাবে আমার নিকট আসছিলো পহেলা এপ্রিল পর্যন্ত আমি তা মৌলভী মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে আসছিলাম। কিন্তু কোন কোন লোক ভুল ধারণার সৃষ্টি করল এবং বললো ঃ 'এটা আমাদের টাকা এবং আমরা এর রক্ষক'। তখন আমি কেবল খোদার সন্তুষ্টির জন্যে টাকা দেয়া বন্ধ করে দিলাম এবং আমি দেখতে চাইলাম, তারা কী করতে পারে। এ বক্তা ভুল করেছে বরং বেয়াদবী করেছে। তার তওবা করা উচিত, এখনও সে তওবা করুক। এ সকল লোক যদি তওবা না করে তবে তাদের মঙ্গল হবে না" (বদর, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)।

(৪) তেমনিভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) লাহোরের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ

"খিলাফত মনোহারী দোকানের সোডা ওয়াটার নয়। তোমরা এ ব্যাপরে গোলমাল করে কোনরূপ ফায়দা হাসিল করতে পারবে না। তোমাদের কেউ খলীফা বানাবে না এবং আমার জীবদ্দশায় অপর কেউ খলীফা হতে পারবে না। যখন আমি মারা যাব তখন সেই ব্যক্তি খাড়া হবে যাকে খোদা চাইবেন। খোদা স্বয়ং তাকে খাড়া করবেন।

তোমরা আমার হাতে অঙ্গীকার করেছো তোমরা খিলাফতের নাম মুখে নিও না। আমাকে খোদা খলীফা বানিয়েছেন। এখন না তোমাদের কথায় আমি খিলাফতচ্যুত হতে পারি এবং না কারও শক্তি আছে যে, আমাকে খিলাফতচ্যুত করে। ... যদি তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি কর তবে স্মরণ রেখো, আমার নিকট এমন খালেদ বিন ওলীদ আছে যারা তোমাদেরকে মুরতাদের শাস্তি প্রদান করবে" (বদর, জুলাই, ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)। খিলাফতের মোকাম এবং মাহাত্ম্য এর চেয়ে আর বেশি বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখে না, তবুও কতিপয় দুর্ভাগা ব্যক্তি এর গুরুত্ব অনুভব করতে না পেরে খিলাফতের বরকতসমূহ হতে বঞ্চিত হয়েছে।

(৫) পরিশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর ঈদুল ফিতরের খুৎবার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি যা হুযূর (রাঃ) মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এবং তার মতাদর্শী আঞ্জুমানের কতিপয় সদস্যের কোন একটি বিষয়ের উপর হুযূর (রাঃ)-এর সাথে মতানৈক্য প্রসঙ্গে প্রদান করেছিলেন ঃ "হযরত সাহেব (আঃ) (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-অনুবাদক)-এর রচনাবলীর মাঝে মা'রেফতের একটি চিহ্ন যা তোমাদিগকে স্পষ্ট করে বলছে। যাকে খলীফা বানাবার ছিল তার ব্যাপার তো খোদাতাআলার নিকট সোপর্দ করে দেয়া হ'ল এবং অন্যদিকে চৌদ্দ ব্যক্তিকে (সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সভ্যগণ-উদ্ধৃতিদাতা) বললেন, তোমরা সমষ্টিগতভাবে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত। তোমাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সরকারের দৃষ্টিতেও এ চূড়ান্ত। অতঃপর সে চৌদ্দজনকেই একত্র করে এক ব্যক্তির হাতে বয়াত করিয়ে দেয়া হয়েছে- তাকে নিজেদের খলীফা মান্য কর এবং এভাবে তোমাদেরকে একতাবদ্ধ করা হয়েছে। আমার খিলাফতের উপর কেবল চৌদ্দজনই নয় বরং সমগ্র জাতির সম্মিলিত ঐক্যমত স্থাপিত হয়েছে। এখন সেই সর্ববাদী সম্মিলিত ঐক্যমতের বিরুদ্ধচারণ করবে সে খোদাতাআলার বিরুদ্ধাচরণ করবে ... এখন যদি এ অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ কর তবে, **ফাআকাবাহুম নিফাকান ফি কুলুবিহিম** (পরিণামে তাদের হৃদয় কপটতাপূর্ণ করা হ'ল) আয়াতের সাক্ষ্য বলে পরিগণিত হবে ... আমি এ সকল লোককে জামাত হতে পৃথক করছি না, হয়ত তারা বুঝতে সক্ষম হবে। তারা যেন বুঝে। আবার বলছি, তারা যেন বুঝে।"

এ খুতবাতে তিনি আবার বললেন ঃ "কতিপয় লোক বলে, আমরা আপনার সম্পর্কে কিছু বলি না। আগমনকারী খলীফার অধিকার এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করছি। কিন্তু তোমরা কেমন করে জানলে যে,তিনি আবূবকর এবং মির্যা সাহেব (আঃ) হতেও ব্যাপকতর কাজের ভার নিয়ে আসবেন না?" (ঈদুল ফিতরের খুতবা-বদর, ১১ই অক্টোবর, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ)।

এ সকল বর্ণনা হতে এটাই প্রকাশিত হয়, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর দৃষ্টিতে খিলাফতের অতি উচ্চ মোকাম ও মর্যাদা ছিলো। খলীফা পার্থিব আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্টের মত নন। তিনি এক আনুগত্যভাজন আধ্যাত্মিক ইমাম যাঁর আনুগত্য ও অনুবর্তিতায় খোদাতাআলার সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং যাঁর বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহ্তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে খিলাফতের মাকাম বুঝবার তৌফীক দান করতে থাকুন, আমীন।

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

সকল কল্যাণ ও আশিস খিলাফতে নিহিত

সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসীহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খিলাফতে নিহিত রয়েছে। নবুওয়ত একটি বীজ বপন করে যার পর খেলাফত এর 'তাসীর' ও প্রভাবকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। তোমরা 'খিলাফতে হাক্কা'-কে মজবুতির সাথে ধর এবং এর আশিস ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর যাতে খোদাতাআলা তোমাদের উপর দয়া ও রহমত বর্ষণ করেন এবং তোমাদিগকে এ জাহানেও উন্নত করেন এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন। আমরণ নিজেদের ওয়াদা পূরণ করে যাও। আমার সন্তানদিগকেও এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সন্তানদিগকেও তাঁদের খান্দানের অঙ্গীকার স্মরণ করাতে থাক। আহমদীয়তের মোবাল্লেগগণ যেন ইসলামের প্রকৃত সিপাহী সাব্যস্ত হন এবং এ দুনিয়াতে খোদায়ে কুদ্দুসের কর্মচারীবৃন্দে পরিণত হন" (আল্ ফযল, ২০শে মে, ১৯৫৯ইং)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা **আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

কুদরতে সানীয়ার পবিত্র পঞ্চম পর্যায়ের সূচনা

ঐশী শক্তি ও মহিমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহের অসাধারণ সম্মেলন

মুল ঃ মোহাতরম মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)

বর্তমান যুগের ইমাম সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তকের ৬-৭ পৃষ্ঠার কুদরতে সানীয়া (দ্বিতীয় বিকাশ)-এর ব্যাপারে এ মর্যাদাপূর্ণ শুভসংবাদ দিয়েছেন ঃ "তোমাদের জন্যে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক। এর আগমন তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা, তা স্থায়ী। এর ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হবে না।"

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৫০ তারিখে ভিক্টোরিয়া রোড, ম্যাগজিন লেন, করাচীর নব নির্মিত মসজিদে প্রথম জুমুআর খুতবা দেন। এতে তিনি মহা শান ও শওকতের সাথে এ সুসংবাদের ওপরে আলোকপাত করে বলেন ঃ

"হযরত মসীহে মাওউদ বলেন, 'আমি তো চলে যাচ্ছি খোদা তোমাদের জন্যে দ্বিতীয় কুদরত পাঠাবেন কিন্তু আমাদের খোদার কাছে কুদরতে সানীয়াই কেবল নয় তাঁর নিকট কুদরতে সালেসা (তৃতীয় কুদরত)-ও রয়েছে। আবার তাঁর কাছে কুদরতে সালেসাই নয় তাঁর কাছে কুদরতে রাবেয়া (চতুর্থ কুদরত)-ও রয়েছে। কুদরতে উলার পরে কুদরতে সানীয়া প্রকাশিত হয়েছে। আর এ ধারাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত কুদরতে সানীয়ার পরে কুদরতে সালেসা আসবে এবং কুদরতে সালেসার পরে কুদরতে রাবেয়া আসবে। আর কুদরতে রাবেয়ার পরে কুদরতে খামেসা (পঞ্চম কুদরত) আসবে। এবং কুদরতে খামেসার পরে কুদরতে সাদেসা (ষষ্ঠ কুদরত) আসবে। আর খোদার হাত লোকদেরকে মু'জিযা দেখাতে থাকবে। দুনিয়ার কোন বড় থেকে বড় শক্তি এবং শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী বাদশাহ্ও এ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের পথে অন্তরায় হতে পারবে না। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে প্রথম ইট বানিয়েছেন আর আমাকে তিনি দ্বিতীয় ইট বানিয়েছেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার বলেন, এ ধর্ম যখন সংকটে পড়বে তখন আল্লাহ্তাআলা এর সংরক্ষণের জন্যে পারস্য বংশীয় কোন কোন ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এদের একজন আর অপর ব্যক্তি আমি। কিন্তু 'রিজালুন' ব্যক্তিবর্গ শব্দে এটা নিহিত যে সম্ভবতঃ পরবর্তী বংশীয় আরও কিছু ব্যক্তিও এমন হবেন যারা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে ও এর ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্যে দাঁড়াবেন (আল্ ফযল ডিসেম্বর ৮, ১৯৫০, পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪)।

ইন্নী মা'আকা ইয়া মাসরূর
'হে মাসরূর! আমি তোমার সাথে আছি'
- ইলহাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

এ হৃদয়গ্রাহী ভাষণের কেবল মাত্র কয়েকদিন পরে আমাদের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ইমাম সৈয়্যদনা হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাস্রূর আহমদ

হযরত মির্যা মাস্রূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস

সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। (কলমের নোট, লেখক মাওলানা আব্দুর রহমান আনোয়ার সাহেব, প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী হযরত খলীফাতুল মসীহ্, পৃষ্ঠা ৯, ছাপা হয় নি)।

আর যেহেতু তাঁর পূত-পবিত্র সত্তা (পারস্যবংশীয়) ব্যক্তিবর্গের উজ্জ্বল প্রমাণ ও দলীলে পরিণত হওয়ার ছিলো এজন্যে তাঁর পবিত্র নাম **মাসরূর আহমদ** রাখা হয়েছে। আর এটা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামী নামও বটে। অতএব ডিসেম্বর ১৯০৭ সনে ইলহাম হলো- আমি তোমার সাথে ও তোমার অনুসারীদের সাথে আছি। **ইন্নী মা'আকা ইয়া মাসরূর** অর্থাৎ হে মাসরূর! আমি তোমার সাথে আছি।

পরে ইলহামের যেসব আরবী এবারত রয়েছে এতে এ প্রতিশ্রুতিও আল্লাহ্তাআলাই তাঁকে দিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে জগতের দিগন্তে দিগন্তে নিদর্শনসমূহ দেখাবেন" (বদর, ডিসেম্বর ১৯, ১৯০৭, পৃষ্ঠা ৪-৫, আল্ হাকাম, ডিসেম্বর ২৪, ১৯০৭, পৃষ্ঠা ৪, তাযকিরাহ্ চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৪৪)।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু-এর শক্তিশালী নিয়তি যে রঙ্গে বিকশিত হওয়া নির্ধারিত ছিলো এর উল্লেখ ২১শে এপ্রিল, ১৯০৩ সনের ইলহামে পাওয়া যায় (স্মরণ রাখা দরকার ২১ এপ্রিল, ২০০৩ তারিখেই মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব, সেক্রেটারী মজলিসে ইনতেখাবে খেলাফত, লন্ডন এর পক্ষ থেকে ২২শে এপ্রিল তাঁর নির্বাচনের ঘোষণা কেবল এমটিএ-তেই বার বার প্রচারিত হয় নি বরং আল ফযল, রাবওয়া-তেও প্রচারিত হয়েছে) যাই হোক ২১শে এপ্রিল-১৯০৩ তারিখের ইলহাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র কলমে আল্ হাকাম ২৪, এপ্রিল ১৯০৩ পৃষ্ঠা ১২তে একশ' বছর পূর্বে প্রচারিত।

"একথা আকাশে ধার্য হয়েছে। পরিবর্তন হবার নয়।"

এরপর এপ্রিল ১৯০৩ সনের তৃতীয় দশকে অনেক ইলহাম হয়েছে। এতে ভবিষ্যতের প্রতাপপূর্ণ ও সৌন্দর্যমন্ডিত পরিবর্তনসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করার পরে ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৩

এ আন্তর্জাতিক ও আনন্দঘন সংবাদ দেয়া হয়েছে, "এতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ নিহিত" (আল্ বদর, ৪মে, ১৯০৩, পৃষ্ঠা, ১২২, তাযকিরাহ্, পৃষ্ঠা ৪৭১)।

এ নববিপ্লব সৃষ্টিকারী ইতিহাস রচনাকারী আন্তর্জাতিক মাহাত্ম্যের প্রথম দৃষ্টান্ত হুযূর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বয়াত ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমটিএ-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে তাঁর আহ্বানের আকারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেখানো হচ্ছে। এর কোন দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে কুদরতে সানীয়ার ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সাফ দিল কো কাছরতে ই'জায ফী হাজত নেহি
ইক নিশাঁ কাফী হ্যা গর দিল মে হো খওফে কিরদিগার॥

(স্বচ্ছ অন্তরের অধিক মু'জিযার নেই কোন প্রয়োজন,

অন্তরে খোদার ভয় থাকলে যথেষ্ট একটি নিদর্শন - অনুবাদক)

পরিশেষে আমার একথা বলা আবশ্যক যে, আল্ ওসীয়্যত পুস্তক দ্বিতীয় কুদরতের ঐশী ব্যবস্থাপনার চিরস্থায়ী সনদের মর্যাদা রাখে। এ পুস্তকখানা আজকাল সর্বদা পাঠ করতে থাকা খুবই আবশ্যক। এ ঐতিহাসিক পুস্তকের দু'টি হৃদয়গ্রাহী ও আবেগ সৃষ্টিকারী উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। প্রথম উদ্ধৃতিটিতে কুদরতে সানীয়ার ... উদ্দেশ্যের ওপরে আলোকসম্পাত করা হয়েছে আর দ্বিতীয়তঃ বিশ্ব-জামাতে আহমদীয়াকে কেবল তাদের মৌলিক দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি বরং তাদের জন্যে বিশ্ব-বিজয়ের দৃষ্টান্তবিহীন ভবিষ্যদ্বাণী বলে দিয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লেখেন ঃ

"খোদাতাআলা চাচ্ছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতিবিশিষ্ট আত্মা যেগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জনবসতিতে বসবাস করছে-তারা ইউরোপেই হোক এশীয়াতেই হোক তাদের সকলকে তৌহীদের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং নিজ বান্দাদেরকে একই ধর্মের ওপরে একত্র করেন এটাই খোদার উদ্দেশ্য। এজন্যে আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা এ উদ্দেশ্যের অনুসরণ করো। কিন্তু এ ব্যাপারে বিনম্র আচরণ, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার ওপরে গুরুত্ব দিবে" (পৃষ্ঠা ৬)।

তদুপরি আরও বলেন, "দেখ, আমি খোদার ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাদেরকে বলছি, তোমরা খোদার একটি মনোনীত জাতিতে পরিণত হবে। খোদার মহিমা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁর একত্ববাদ কেবল মুখেই স্বীকার করবে না বরং ব্যবহারিক জীবনেও প্রকাশ করবে যেন খোদাও কার্যতঃ তোমাদের ওপর করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে বিরত থাকবে। আর মানব জাতির প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিশীল ব্যবহার করবে।

পুণ্যের প্রতিটি পথ অবলম্বন করবে। বলা যায় না কোন্ পথে তোমরা তাঁর নিকট গৃহীত হবে। তোমাদের জন্যে সুসংবাদ, খোদাতাআলার নৈকট্য লাভের মাঠ খালি। সব জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। খোদা সন্তুষ্ট হন জগদ্বাসীর সে দিকে কোন খেয়াল নেই। যারা পূর্ণ উদ্যমে এ দরজায় প্রবেশ করতে চান তাদের নিজেদের সদ্‌গুণের পরিচয় দেবার ও খোদার কাছ থেকে বিশেষ পুরস্কার লাভের এটাই সুযোগ।

কখনও মনে করবে না, খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ এটা মাটিতে বপন করা হয়েছে। খোদাতাআলা বলেন, 'এ বীজ বাড়বে প্রসার লাভ করবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা বের হবে আর এক মহামহীরূপে পরিণত হবে' (অনুবাদক)। সুতরাং কল্যাণমন্ডিত তারা, যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং মধ্যবর্তীকালীন বিপদাবলীর জন্যে ভীত হয় না। কারণ বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক যেন খোদাতাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- তোমাদের মাঝে নিজ বয়াতের দাবীতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? যে-ই কোন বিপদের সময় পদস্খলিত হবে সে খোদার কোন অনিষ্ট করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে। তার জন্ম না হলেই তার পক্ষে ভাল ছিলো। কিন্তু সেসব ব্যক্তি যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করবে তাদের ওপর বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসবে, দুর্ঘটনার ঝড় বইবে, জাতিগণ তাদের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করবে এবং জগৎ তাদের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবে; কিন্তু পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে, আর আশিসের দরজাগুলো তাদের জন্যে খোলা হবে" (আল্ ওসীয়্যত, ৮-৯)।

কুদরত সে আপনি যাত কা দেতা হ্যা ছবূত
ইস বেনিশাঁ কি চেহারানুমায়ী এহিতো হ্যা॥
জিস্ বাত কো কাহে কেহ্ কারুঁঙ্গা ইয়েহ্ ম্যা যরূর
টলতি নেহি ওহ্ বাত খুদাই এহি তো হ্যা॥

[অর্থাৎ, শক্তি ও মহিমার মাধ্যমে নিজ সত্তার দিয়ে থাকেন প্রমাণ,

এ নিরাকার সত্তার এটাই তো চেহারা প্রদর্শন।

যে কথার ব্যাপারে বলেন, করে ছাড়বো এটাই

টলে না সে কথা কভু; খোদার কাজ তো এটাই- অনুবাদক] (২৯-৪ -২০০৩ তারিখের সপ্তাহিক বদর-এর সৌজন্যে।

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

সন্তান লাভ

গত ১৯/০৩/২০০৩ইং তারিখে রোজ রবিবার বিকাল ৪.৩৫ মিনিটে শ্যামনগর "প্রসূতী ডেলিভারী ভবনে" সিজারের মাধ্যমে খোদাতাআলা আমাকে একটি মেয়ে সন্তান দান করেছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। মেয়েটির ডাক নাম রাখা হয়েছে আমাতুন নাসীর তুবা। বর্তমানে মেয়ে সুস্থ আছে এবং তাঁর আম্মা ও সুস্থতার দিকে।

উক্ত মেয়েটিকে ওয়াকফে নও-তে শামেলের জন্য হুযূরকে পত্র লেখা হয়েছিল জন্মের পূর্বেই তখন হুযূর অসুস্থ ছিলেন। কোন উত্তর পাই নি। তাই মেয়েটি যেন খাদেমে দীন হয় দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে এজন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

শেখ আঃ ওয়াদুদ
মোয়াল্লেম

দোয়ার জন্য আবেদন

আমি, সালাহউদ্দিন আহমদ (পিতা মরহুম মাষ্টার মহিউদ্দিন আহমদ) গত ৬/৫/০৩ইং রোজ মঙ্গলবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ৬নং ওয়ার্ডে ভর্তি হই। ৮/৫/০৩ইং আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ মেহেরবানীর ফলে ছুটি পেয়ে নিজ বাসায় আসি। বর্তমানে সকল আহমদী ভাই ও বোনসহ আমাদের বর্তমান ৫ম খলীফার নিকট বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থনা করছি যাতে আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন এবং জামাতের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি।

- সালাহউদ্দীন আহমদ
৬৫ নতুন পল্টন
আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

সংশোধনী

অনবধানবশতঃ ও যান্ত্রিক কারণে পাক্ষিক আহমদীর ৩০-৪-২০০৩ তারিখের সংখ্যায় নিম্নোক্ত ত্রুটি রয়ে গেছে। আমরা এজন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। - **নির্বাহী সম্পাদক**

পৃষ্ঠা	কলাম	লাইন	যা আছে	যা হবে
১৬	১	৪	দৌহিত্র	পৌত্র
৩১	৩	১৫	দোয়া করান এবং	দোয়া করান। মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী,মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

[হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে সত্যের মাধ্যমে মীমাংসা করে দাও, তুমিই যে সর্বোত্তম মীমাংসাকারী- অনুবাদক]

ভূমিকা

এ পুস্তক আমি এ উদ্দেশ্যে লিখছি, যাতে সন্দেহাতীত সত্য ঘটনাবলী, চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অ-মুসলিম জাতিদের প্রাচীন দলিল-পত্র ও গ্রন্থাদির উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রাথমিক ও পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অধিকাংশ মুসলমান ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলোর মাঝে ছড়িয়ে থাকা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাকে দূর করি। এসব ভ্রান্ত ধারণা কেবল মহান স্রষ্টার তৌহীদকেই বিনষ্ট ও ধ্বংস করে না, বরং এ দেশের মুসলমানদের নৈতিকতার উপরও ক্রমাগত অত্যন্ত বিরূপ ও বিষাক্ত প্রভাব ফেলতে দেখা যায়। এ ধরনের ভিত্তিহীন কেস্সা-কাহিনীতে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখায় অধিকাংশ মুসলিম ফির্কার মাঝে সচ্চেতনা ও সদাচরণের অভাব, নৈতিক অবক্ষয়, হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতাসূলভ কঠিন আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। এদের মানবতাবোধ দয়া-মায়া, কোমলচিত্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা, বিনয় ও নম্রতা এসব পবিত্র গুণ দৈনন্দিন লোপ পাচ্ছে, যেন এগুলো এখন শীঘ্র এদের কাছ থেকে বিদায় নিতে উদ্যত। হৃদয়ের এ কঠোরতা, নৈতিক অবক্ষয় ও নিষ্ঠুরতার দরুন বহু মুসলমানকেই এমন অবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, তাদের এবং হিংস্র জন্তুর মাঝে বোধ হয় খুব কমই পার্থক্য থাকতে পারে। একজন জৈন কিংবা বৌদ্ধ তো একটা মশা বা উকুন মারতেও ভয় পায় ও বিরত থাকে; কিন্তু আফসোস! আমাদের মুসলমানদের অনেকেই এমন, যারা কোন অন্যায় রক্তপাত ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ নাশের বেলায়ও সেই সর্বশক্তিমান খোদার শাস্তিকে ভয় করে না, যিনি পৃথিবীর সকল জীবের তুলনায় মানুষের জীবনকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। এত হৃদয়হীনতা, নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার কারণ কী? এর কারণ এটাই যে, শৈশবকাল থেকে এহেন কেস্সা-কাহিনী এবং অসঙ্গতভাবে জেহাদের অপব্যাখ্যা তাদের কানে দেয়া হয় ও তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যার দরুন ক্রমশঃ তাদের নৈতিক মূল্যবোধ নির্জীব হতে থাকে এবং তাদের অন্তর এসব ঘৃণ্য কার্যকলাপের হীনতা কদর্য ও নিষ্ঠুরতাকে আর অনুভব করতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি কোন অজানা-অচেনা ও অসচেতন মানুষকে হত্যা করে ও তার পরিবার-পরিজনকে ধ্বংসের কবলে ফেলে দেয়, সে মনে করে সে যেন খুব বড় একটা পুণ্যের কাজ করেছে, বরং সে তার জাতির মাঝে গৌরব অর্জন করার এক সুযোগ লাভ করেছে বলে মনে করে। আর যেহেতু আমাদের দেশে এ জাতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে জনগণের মাঝে ধর্মীয় হিতোপদেশপূর্ণ বক্তৃতা ভাষণ দেয়া হয় না। দেয়া হলেও তা কপটতার ছদ্মাবরণে দেয়া হয় সেহেতু জনসাধারণের ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতা এসব মন্দ কার্যকলাপের সমর্থনের প্রতি ঝুঁকে আছে। কাজেই আমি আমার জাতির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দয়াপরবশ হয়ে ইতোপূর্বেও উর্দু ফার্সী ও আরবী ভাষায় একাধিক পুস্তক প্রণয়ন করে তাতে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, মুসলমানদের মাঝে জেহাদের (অপব্যাখ্যাজনিত) প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী ও রক্তপাতকারী এক ইমামের আগমনের জন্য অপেক্ষা এবং অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ সংক্রান্ত বিষয়- এ সবই হচ্ছে এক শ্রেণীর সংকীর্ণচেতা উলামার ভুল-ভ্রান্তির ফসল। নচেৎ ইসলাম ধর্মে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ অথবা অত্যাচারীকে শাস্তি প্রদান বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনভাবে ধর্মের জন্য অস্ত্র ধারণের অনুমতি নেই। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলতে বুঝায়, শত্রুর আক্রমণে জীবননাশের আশংকায় যেসব যুদ্ধ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। শরীয়তসম্মত জেহাদ কেবল এ তিন প্রকারের। এ তিন প্রকার যুদ্ধ ছাড়া ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার যুদ্ধ ইসলামে বৈধ নয়। মোটকথা, এ বিষয়ে (আমার রচিত) বই-পুস্তক প্রচুর অর্থ ব্যয় করে আমি এ দেশে এবং আরব, সিরিয়া, খুরাসান ইত্যাদি অন্যান্য দেশেও বিতরণ করি। কিন্তু এখন আল্লাহ্তাআলার ফযলে এসব ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা মানুষের মন থেকে উৎপাটন করার জন্য অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তত্ত্ব-তথ্য আমার নিকট প্রতিভাত ও উদঘাটিত হয়েছে। সেগুলোর সত্যতার কারণ আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছে, অচিরে এগুলোর প্রচার ও প্রসারের পর মুসলমানদের অন্তরে উল্লেখিত ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটবে। আর আমি নিশ্চিত আশা রাখি, এ সকল সত্য বুঝে নেয়ার ও হৃদয়ঙ্গম করার পর ইসলামের পুণ্যবান সন্তানদের হৃদয়ে সহিষ্ণুতা, উদারতা, বিনয়-নম্রতা ও দয়া-মায়ার মনোরম স্রোতধারা বয়ে যাবে এবং তাদের আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে সারা দেশ জুড়ে এক সুস্থ ও আশিসপূর্ণ প্রভাব পড়বে। তেমনি আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, খ্রীষ্টধর্মের তথ্যানুসন্ধানী গবেষকগণ এবং অন্যান্য সকল (জাতির) সত্য পিপাসুরাও আমার এ পুস্তক দ্বারা উপকৃত হবেন। আর আমি যে এখনই বলে এসেছি এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সেই ভুল সংশোধন করা, যা তাদের কোন কোন ধর্মবিশ্বাসে স্থান পেয়েছে- এটা কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে। অতএব তা আমি নিম্নে উপস্থাপন করছি ঃ

জানা আবশ্যক, অধিকাংশ মুসলমান ও খ্রীষ্টান বিশ্বাস করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) জীবিতাবস্থায় (সশরীরে) আকাশে উঠে গেছেন। এ উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল থেকে এ বিশ্বাসই পোষণ করে আসছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) এখনও জীবিত আছেন এবং শেষ যুগে কোন সময় পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসবেন। ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এ উভয় দলের মাঝে মত পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, খ্রীষ্টনদের মতে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যান। তারপর পুনরুত্থিত (পুনরায় জীবিত) হয়ে সশরীরে আকাশে উঠে যান ও তার (পিতার অর্থাৎ আল্লাহ্র) ডান পার্শে গিয়ে বসেন, আবার শেষ যুগে পৃথিবীতে বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আসবেন। তারা আরও বলেন, পৃথিবীর স্রষ্টা ও প্রভু তথা খোদা সেই যীশু মসীহ্ ছাড়া অন্য কেউ নয়, আর তিনিই দুনিয়ার অন্তিম যুগে মানুষের শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের জন্য রুদ্রমূর্তিতে পৃথিবীতে নামবেন। তখন প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে তাঁকে বা তাঁর মাকেও খোদা (উপাস্য) হিসেবে মেনে নেয় নি তাকে ধরে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে। সেখানে কান্না-কাটি ও বিলাপ তার ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু উল্লেখিত ফির্কাগুলোর মাঝে মুসলমানরা বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধও হন নি এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারাও যান নি। বরং ক্রুশবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ইহুদীরা যখন তাঁকে পাকড়াও করলো তখন খোদার ফিরিশ্তারা তাঁকে সশরীরে আকাশে তুলে নিলেন। আকাশে তিনি এখনও জীবিত আছেন। আর তাঁর অবস্থানস্থল হচ্ছে দ্বিতীয় আকাশ, যেখানে ইয়াহিয়া অর্থাৎ যোহনও রয়েছেন। সেই সাথে মুসলমানরা এ-ও বলেন যে, ঈসা (আঃ) হচ্ছেন এক বিশেষ মর্যাদার নবী, তবে তিনি খোদা বা খোদার পুত্র নন। তারা এ-ও বিশ্বাস পোষণ করেন যে, তিনি শেষ যুগে দু'জন

ফিরিশ্‌তার কাঁধে ভর করে দামেস্কের মিনারার নিকট অথবা অন্য কোন জায়গায় অবতীর্ণ হবেন। এর পূর্বেই পৃথিবীতে বনী ফাতিমা বংশোদ্ভুত ইমাম মাহ্‌দী মুহাম্মদ মজুদ থাকবেন। হযরত মসীহ্ তাঁর সাথে মিলিত হয়ে একযোগে তারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল অমুসলিমকে হত্যা করবেন। যে ব্যক্তি অনতিবিলম্বে মুসলমান হয়ে যাবে কেবল তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ছাড়বেন না। মোটকথা, মুসলমানদের মাঝে যে ফের্কা আহলে সুন্নত বলে পরিচিত অথবা আহলে হাদীস, যারা জনসাধারণের মাঝে ওহাবী নামে অভিহিত, তাদের মতে পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, তিনি হিন্দুদের মহাদেবের ন্যায় গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করবেন। প্রথমে মুসলমান হয়ে যাওয়ার জন্য ধমক দেবেন। তা সত্ত্বেও মানুষ কুফরীতে কায়েম থাকলে তাদের সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবেন। তারা বলেন, উক্ত উদ্দেশ্যেই তাঁকে পার্থিব দেহসহ আকাশে জীবিত রাখা হয়েছে, যাতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়ার সময় তিনি নেমে এসে অমুসলিমদেরকে হত্যা করেন এবং বল প্রয়োগে মুসলমান করেন অথবা অস্বীকার করলে বধ করেন। বিশেষ করে খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে আলেমরা খুব জোরে-শোরে উল্লেখিত ফের্কাসমূহের বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) যখন আকাশ থেকে নামবেন তখন দুনিয়ার সমস্ত ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন ও তলোয়ারের জোরে নির্মম কর্মকান্ড ঘটিয়ে পৃথিবীকে রক্তে ভরে দেবেন। এখনই যেমন আমি বলে এসেছি এরা অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে আহ্‌লে হাদীস ইত্যাদি ফের্কার লোকেরা খুব জোশের সাথে তাদের এ আকীদা-বিশ্বাস প্রকাশ করে থাকে যে, ঈসা মসীহ্‌র অবতীর্ণ হবার কিছুকাল পূর্বে বনী ফাতিমা থেকে এক ইমাম জন্মলাভ করবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ মাহ্‌দী আর কুরায়েশ বংশোদ্ভুত হবার দরুন তিনিই প্রকৃতপক্ষে যুগ-খলীফা ও বাদশাহ্ হবেন। তারই প্রকৃত লক্ষ্য হবে, কেবল এমন ব্যক্তি যে তখন তখনই কলেমা পড়ে নেয় সে ছাড়া ইসলাম অস্বীকারকারী সকল জাতির সকল অমুসলিমকে হত্যা করা, কাজেই তার সাহায্য-সহযোগিতার উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। আর যদিও হযরত ঈসা (আঃ) নিজেও একজন মাহ্‌দী বরং বড় মাহ্‌দী তিনিই, কিন্তু যুগ-খলীফার পক্ষে কুরায়েশ বংশোদ্ভুত হওয়া জরুরী বিধায় হযরত ঈসা (আঃ) যুগ-খলীফা হবেন না, বরং যুগ-খলীফা উল্লেখিত মুহাম্মদ মাহ্‌দী হবেন। তারা আরও বলেন, এ দু'জন একত্র হয়ে পৃথিবীকে রক্তে রঞ্জিত করে ফেলবেন। এত রক্তপাত করবেন যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সূচনা থেকে শেষ অবধি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসা মাত্র তারা রক্তপাত শুরু করে দেবেন। কোন হিতোপদেশও দান করবেন না এবং কোন নিদর্শনও দেখাবেন না। তারা আরও বলেন, যদিও হযরত ঈসা (আঃ) ইমাম মুহাম্মদ মাহ্‌দীর জন্যে পরামর্শদাতা বা মন্ত্রীস্বরূপ হবেন এবং ক্ষমতার রাস মাহ্‌দীর হাতে থাকবে, কিন্তু হযরত মসীহ্ দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী মুহাম্মদকে সবসময় উস্কানি দেবেন ও চরম পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে উগ্র পরামর্শ দিতে থাকবেন যেন সেই নম্রতা ও (সদাচরণের) নৈতিক শিক্ষার শোধ তোলেন, যা তিনি প্রথম আগমনকালে মানুষকে দিয়েছিলেন, যেমন 'কারও অশিষ্টাচার ও ক্লেশের মুকাবিলা করো না, বরং এক গালে চপেটাঘাত খেয়ে তোমার অপর গালটিও পেতে দাও'। (চলবে)

অনুবাদ- মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ছোটদের পাতা

এস হাদীস শিখি

(১০ম কিস্তি)

(৩৫) মায়ের উচ্চ মর্যাদা

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

(আল্ জান্নাতু তাহ্‌তা আক্বদামি উম্মাহাতি-বুখারী)

অর্থ ঃ মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত।

ব্যাখ্যা ঃ দায়িত্ব পালনের দিক থেকে মায়ের মর্যাদা অনেক বেশি। অন্য এক হাদীস থেকে জানা যায় মায়ের মর্যাদা পিতার চেয়ে তিনগুণ। মা হলেন মাতা তথা নির্মাতা। আদর্শ মায়ের সঠিক প্রতিপালনে ও তা'লীম-তরবিয়তে সন্তানের ব্যক্তি-সত্তা গড়ে উঠে এক আশ্চর্য আদলে। মায়ের অপরিসীম চেষ্টা-সাধনা ও দোয়ার বরকতে যে একটি সন্তানের ইহ ও পরকালের শান্তি তথা জান্নাত রচিত হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। মায়ের দিন দিন প্রতিদিনের মধুর উপদেশ বাণী ও মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বিসর্জনে সন্তান তাকওয়া ও পুণ্যের এক মূর্ত প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তাই নবী করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাক্য মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত অর্থাৎ মায়ের শিক্ষা ও আদর্শের শিক্ষাধীনে সন্তানের বেহেশ্‌ত গড়ে উঠতে পারে- একটি দিক দিশারী বাণী। এ সূক্ষ্ম কথাটি অন্যরাও উপলব্ধি করেছিলেন কতকটা। তাই একজন বলেছেন - যে হাত দোলনা দোয়ায় সে হাত দেশ শাসন করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছেন- আমাদের একটি আদর্শ মা দাও তোমাকে একটি আদর্শ জাতি দেব। বাস্তবতা তা-ই সাক্ষ্য দেয়। যারাই বেহেশ্‌ত লাভ করেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি তাঁদের প্রত্যেকের মা-ই ছিলেন আদর্শস্থানীয়া পুণ্যবতী মহিয়সী মহিলা। অন্য দিকে এ হাদীস দ্বারা মায়ের সেবার ফলে একজন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করে বেহেশ্‌ত অর্জন করতে পারে তা-ও বুঝায়। সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই পুণ্যবান হতে হবে। নইলে প্রশ্ন ওঠবে, খারাপ লোকও কি কেবল মায়ের সেবা করে বেহেশ্‌ত লাভ করতে পারবে?

(৩৬) দু'টি মূল্যবান কথা

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ- سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ- (بخارى)

(কালিমাতানি হাবীবাতানি ইলার্‌রহমানি খাফীফাতানি 'আলাল্‌লিসানি ছাকিলাতানি ফিল মীযানি- সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল 'আযীম- বুখারী)

অর্থ ঃ দু'টি বাক্য পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী আল্লাহ্‌র কাছে খুবই প্রিয়। জিহ্বার উচ্চারণে খুবই হালকা (অর্থাৎ সহজে বলা যায়) কিন্তু ওজনে (আল্লাহ্‌র নিকট) খুবই ভারী। আর তা হলো এই ঃ আল্লাহ্ পবিত্র এবং প্রশংসাসহ বিদ্যমান। পবিত্র আল্লাহ্ অতি মহান।

ব্যাখ্যা ঃ কোন ছোট পুণ্যও আল্লাহ্‌র দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি ছোট ছোট পুণ্য পদক্ষেপকেও কদর করে থাকেন। এ হাদীসে ছোট দু'টি প্রশংসাবাচক বাক্য আল্লাহ্‌র জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এ বাক্য দু'টি ছোট কিন্তু

আল্লাহ্‌র প্রশংসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ওজনদার এবং আল্লাহ্‌র খুব পসন্দনীয়। এতে খুবই অল্প কথায় আল্লাহ্‌র ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ) স্বয়ং এভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করাকে পসন্দ করতেন।

কুরআন করীমের সূরা নূরের ৪২ আয়াতে, সূরা বনী ইসরাঈলের ৪৫ আয়াতে আর সূরা ক্বাফের ৪০-৪১ আয়াতেও আল্লাহ্‌র প্রশংসা সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায়

১৮৮০ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামকে আল্লাহ্‌তাআলা একটি দোয়া শিখিয়েছিলেন। এ বাক্য দু'টোর সাথে আল্লাহুম্মা সল্লি'আলা মুহাম্মাদিঁওয়ালি মুহাম্মদ [হে আল্লাহ্ মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ কর] বাক্যটি সংযোজন করা হয়েছিলো।

এ দোয়ার সাথে একটি বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তিনি মরণাপন্ন একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন।

(৩৭) সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

(মা আসকারা কাছীরুহু ফা ক্বলীলুহু হারামুন - আবূ দাউদ)

অর্থ ঃ কোন জিনিষের বেশি পরিমাণ যদি নেশা উৎপন্ন করে তাহলে এর সামান্য পরিমাণও নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি ৩টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রথমতঃ মুসলমানের জন্যে সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য হারাম বা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ কোন জিনিষের বেশি পরিমাণ যদি নেশা উৎপন্ন করে তাহলে এর অল্প পরিমাণও নিষিদ্ধ। তৃতীয়তঃ এ ধরনের কু-অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র প্রতিকার হলো এর অঙ্কুরেই বিনাশ সাধন। অর্থাৎ সামান্য মাদকদ্রব্যও যেন ব্যবহার করা না হয়। কেননা, সামান্য ব্যবহার করতে করতেই মানুষ বেশি ব্যবহার করতে শিখে এবং পরে তা নেশায় পরিণত হয়।

আল্ কুরআনের সূরা বাকারার ২২০ আয়াতে যদিও মাদকদ্রব্য ও জুয়ায় কিছুটা উপকার আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি এতে ক্ষতির মাত্রা উপকারের চেয়ে বেশি তাই এথেকে সুরক্ষার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৯১-৯২ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, এ ধরনের মাদক- দ্রব্য শয়তানী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্দ্বারা সে তোমাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে নিবৃত্ত রাখতে চায়। আজকাল মাদকদ্রব্যের ব্যবহার সমাজকে ভাবিয়ে তুলছে। সমাজে এখন আমরা উপরোক্ত চিত্রই দেখতে পাই। তাই সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন এ ধরনের নেশাদ্রব্যের ধারে কাছেও আমাদের ছেলে-পেলেরা না যায়। প্রথম থেকেই তাদের মাঝে এ প্রসঙ্গে ঘৃণা ও সচেতনতা গড়ে তোলা আবশ্যক।

(৩৮) আল্লাহ্‌র সাহায্য

اَللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ۔

(আল্লাহ্ ফী 'আওনিল 'আব্‌দি মা কানাল 'আব্‌দু ফী 'আওনি আখীহি-বুখারী)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা সে ব্যক্তিকে সাহায্য করেন যে নিজ ভাইকে সাহায্য করে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে ভাই বলতে প্রথমতঃ মুসলিম ভাইকে বুঝাচ্ছে। পরে গোটা মানব জাতিকে বুঝাচ্ছে। পবিত্র কুরআনেই সূরা মায়েদার ৩ আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমরা পুণ্য ও তাকওয়া (অর্থাৎ খোদা-ভীরুতা)-এর পথে পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা কর"।

মানুষ এ সোনালী সূত্রকে অবলম্বন করলে মানুষ দু'দিক থেকে পুরস্কৃত ও লাভবান হয়ে থাকে। একতো তার সমশ্রেণীর লোককে পুণ্য কাজে সহায়তা করে সে পুণ্যবান হতে পারে আর দ্বিতীয়তঃ সে মানবের প্রতি তার দায়িত্বকে ভালভাবে পালন করতে পারে। আল্ কুরআনের সূরা আ'রাফের ১২৯ আয়াতে এবং সূরা জাসিয়ার ২০ আয়াতে কেবল পুণ্যবান লোকেরাই আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করে থাকে এবং তারাই বিজয়ের মুখ দেখে থাকে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেবার মনোভাব জাগরূক থাকলে গোটা সমাজই লাভবান হবে। এখানে লক্ষ্যণীয়, পুণ্য কাজে সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। মন্দ কাজে সাহায্যের কথা বলা হয় নি। মন্দ কাজের সহযোগী না পেলে সমাজ থেকে মন্দ কাজের লোক এমনিতেই যে কম হতে থাকবে এ কথা নিশ্চিৎ করে বলা যায়।

(৩৯) তাকওয়ার উত্তম পাথেয়

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

(খয়রুয্‌যাদিত্তাক্বওয়া)

অর্থ ঃ (পরকালের) পথে উত্তম পাথেয় হলো তাক্বওয়া (অর্থাৎ খোদা-ভীতি)।

ব্যাখ্যা ঃ সতর্ক পথিক সব সময় পথের সম্বল সাথে নিয়ে চলে। ধর্মের পথ অতি দীর্ঘ ও দুর্গম। এ পথে চলার জন্যেও যে পাথেয় আবশ্যক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ পথে চলতে পার্থিব দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না। এ পথের উত্তম পাথেয় ও সম্বল হলো তাক্ওয়া। তাকওয়া একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। সাধারণতঃ এর অর্থ করা হয় খোদা-ভীতি। এর অপর অর্থ হলো সাবধানতা-ক্ষতিকর বস্তু থেকে সুরক্ষা লাভ, বর্ম বা ঢাল প্রভৃতি।

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একজন বিখ্যাত সাহাবী হযরত উবায় বিন কা'ব তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন- 'মুত্তাকী বা তাকওয়াপরায়ণ সেই ব্যক্তি যে কাঁটাযুক্ত জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এমন সাবধানে চলে যাতে তার কাপড়-চোপড় কাঁটায় জড়িয়ে না যায় বা ডাল-পালার আঘাতে ছিঁড়ে না যায় (কাসীর)। মুত্তাকী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌কে ঢাল বা বর্ম এবং আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে অতি সাবধানতার সাথে সব সময় পাপের কাজ থেকে আত্মরক্ষা করেন। এবং নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সযত্নে পালন করে থাকেন। সুতরাং মানুষের ইহকাল থেকে পরকালের দিকে যাত্রা পথে এমন কি এর পরেও তার উত্তম সম্বল ও পাথেয় হলো তাকওয়া। তাকওয়া ব্যতিরেকে ধর্ম হতেই পারে না। আর তাকওয়াবিহীন ধর্ম অসার-অচল। ধর্ম-কর্মের মূলে রয়েছে তাকওয়া আর এটা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। চোখে দেখার বিষয় নয়। কাজে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ তাকওয়ার ব্যাখ্যাস্বরূপ যুগ-পুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ অনেক কথা বলেছেন। এথেকে নিম্নে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো ঃ "নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখো, কোন কর্ম খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যা তাকওয়াশূন্য। প্রত্যেক পুণ্যের মূল তাকওয়া। যে কাজে এ মূল বিনষ্ট হবে না সে কাজও বিনষ্ট হবে না" (কিশতিয়ে নূহ ঃ ৩১ পৃষ্ঠা)।

- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

একটি প্রবন্ধ ঃ একটি পর্যালোচনা

দৈনিক ইনকিলাবের এপ্রিল ১০, ২০০৩ সংখ্যায় জনৈক ডঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক পরিবেশিত 'কবে আসবেন ইমাম মাহ্দী (রাঃ) একটি গাণিতিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ প্রবন্ধের জন্যে ডক্টর সাহেবকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। দেরীতে হলেও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য তথা ইসলামের বিশ্ব-বিজয় হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের সাথে সম্পৃক্ত। কোন গদ্দীনশীন পীর বা কোন রাষ্ট্র নায়ক অথবা কোন রাজনৈতিক দল তথা আন্দোলন বিক্ষোভ করে এটা সম্ভব নয়। ভোটাভুটির মাধ্যমেও এ সম্ভব নয়। তিনি যথার্থই লিখেছেন, 'পবিত্র ইসলাম ধর্মমতে ইমাম মাহ্দী (রাঃ)-এর আগমন বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম। ইমাম মাহ্দী (রাঃ) প্রকৃত মুসলমানদের বিপদের সময় রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হবেন।'

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভাষ্য অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদকে হাদীসে ও ইসলামী সাহিত্যাদিতে 'আলায়হেস সালাম' -এ ভূষিত করা হয়েছে। আহমদী জামাত আন্তরিকভাবে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে নবী করীম (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ, অনুকরণ, ও গোলামীতে একজন উম্মতী নবী হিসেবে মান্য করে (সূরা নিসার ৭০ আয়াত ও হাদীস, মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০১-৪০২, মিসরী ছাপা)।

১) আলায়হেস সালাম, ২) রাযিয়াল্লাহু আনহু, ৩) রহমাতুল্লাহে আলায়হে প্রভৃতি ইসলামী ইসতেলাহ্ বা পরিভাষা। নবীর ক্ষেত্রে প্রথমটি, মৃত সাহাবাগণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি এবং মৃত মুসলিম ওলী ও বুযুর্গানের ক্ষেত্রে তৃতীয়টি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নবী করীম (সঃ) ইমাম মাহ্দীকে 'আলায়হেস সালাম' বলার কারণে আহমদীরা তাঁকে নবীর মর্যাদা দিতে যুক্তি পেশ করে থাকেন। অন্যরা মনে করে রসূলে করীম (সঃ)-এর পরে কোন প্রকার নবী আসবেন না। এ উভয় সংকট কাটাতে গিয়ে কেউ কেউ ইতোপূর্বে তাঁকে তাদের বইতে প্রথম সংস্করণে 'আলায়হেস সালাম' ও পরবর্তী সংস্করণে 'রহমাতুল্লাহে আলায়হে' লিখেছেন। অথচ রহমাতুল্লাহে আলায়হে যে মৃত ব্যক্তির নামে ব্যবহৃত হয় তা তারা বেমালুম ভুলে গেছেন। আমাদের আলোচিত প্রবন্ধের ডক্টর সাহেব এক ধাপ এগিয়ে ইমাম মাহ্দীকে (আঃ)-এর বেলায় (রাঃ) ব্যবহার করেছেন অথচ (রাঃ) মৃত সাহাবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ডক্টর সাহেবের এহেন লেখাতে 'হাসিব না কাঁদিব ঠাহর করিতে পারিতেছি না'। ডক্টর সাহেব এ ক্ষেত্রে শেয়ালের গর্ত থেকে বের হবার চেষ্টা করে বাঘের গর্তে প্রবেশ করেন নাই কি?

ডক্টর সাহেবকে গণিত শাস্ত্রের একজন সুপন্ডিত বলে মনে হয়। তিনি কুরআন ও হাদীসের সূত্রের পরিবর্তে হযরত শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ্ ও জিন্ন ডিকশনের (সম্ভবতঃ একজন খৃষ্টান) ভবিষ্যদ্বাণীকে আনুমানিক ভিত্তিতে স্বউদ্ভাবিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অংক কষে কষে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের একটি সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। একটা ফল বের করেই বলেছেন, 'আল্লাহ্ই ভাল জানেন'। আল্লাহ্ই যদি ভাল জানেন তাহলে তিনি এ পন্ডশ্রম করেছেন কেন? তিনি পাঠকদেরকে বার বার আশার আলো দেখিয়ে সাথে সাথেই আবার অন্ধকারে ছুঁড়ে মেরেছেন। নিজেও যেমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন তেমনি পাঠকদেরকেও ভোগাচ্ছেন। এর আগেও শর্ষীনার মোহতামীম সাহেব তাঁর এক পুস্তকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আবির্ভাব কাল ঠিক করেছিলেন ১৯৯৮-২০০০।

সময় নির্ধারণের আসল মাপকাঠি

"হযরত আবূ কাতাদা নবী করীম (সঃ)-এর এক হাদীস উল্লেখ করে বলেছিলেন, দু'শত বৎসর পরে নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পাবে (ইবনে মাজা শরীফ)।

হাদীসের শরাহ্ মিরকাত প্রণেতা হযরত মোল্লা আলী কারী-উদ্ধৃতিকার) নামক গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "এক হাজার হিজরী সনের পরে (সূরা আস্ সাজদাহ্ ঃ ৬ আয়াত অনুযায়ী-উদ্ধৃতিকার) দু'শত বছর অর্থাৎ বার শত বৎসর পরে কেয়ামতের নিদর্শনসমূহ দেখা দেবে যথা ইমাম মাহ্দীর আত্ম প্রকাশ ইত্যাদি..."(ইমাম মাহ্দী ও কিয়ামতের নিদর্শন, প্রণেতা মাওলানা বদিউল আলম, প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৫০০ হিজরী সন পালন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)।

এ প্রসঙ্গে মিশকাতের মুজতাবাঈ ছাপা পৃষ্ঠা ২৭১, পৃষ্ঠা ৪৭১ হাশিয়া দেখুন। আরও দেখুন হাশিয়া ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬১, হাশিয়া আল্লামা সিন্ধি।

এতদ্ব্যতিরেকে আরও অনেক বুযুর্গ এ হাদীসের আলোকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জন্ম ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং তাঁর দাবী ৪০ বছর বয়ক্রম কালে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে নির্ধারণ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যাথেকে প্রমাণ করা যায় যে, ইমাম মাহ্দী চতুর্দশ শতাব্দী পার হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আগমন করবেন। তাছাড়া সূরা নূরের ৫-৬ আয়াতের 'কামা' ও সূরা মুয্যাম্মিলের ১৬ আয়াতের 'কামা' শব্দের সাদৃশ্য অনুযায়ী মুসায়ী মসীহ্ (আঃ)-এর ন্যায় মুহাম্মদ মসীহ্ (আঃ)-এরও আবির্ভাব কাল চতুর্দশ শতাব্দীতে। কোনক্রমেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে নয়। ডক্টর সাহেব অনুগ্রহ করে কুরআন হাদীসের এসব সূত্রগুলো নিয়ে একটু গবেষণা করে দেখবেন কি? হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্দী (আঃ) যথাসময়ে আবির্ভূত হয়ে তাঁর কাজ করে গেছেন। তিনি তাঁর উর্দূ কবিতায় লিখেছেন ঃ

ওয়াক্ত যা ওয়াক্তে মসীহা না কিসি
আওরা কা ওয়াক্ত,
ম্যায় না আতা তো কোই আরও হি আয়া হোতা॥

অর্থাৎ সময়টা ছিলো মসীহের (আগমনের) সময় আর কারও সময় ছিলো না,
আমি না আসলে অন্য আর কেউই (এ হিসেবে) আসতেন ॥

ডক্টর সাহেব তাঁর প্রবন্ধের শেষে ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আত্ম প্রকাশের প্রেক্ষাপটে আগামী রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের কথা উল্লেখ করে পুনরায় একটি গোলক ধাঁ ধাঁ সৃষ্টি করেছেন। আপামর সরল সহজ জনগণ

এথেকে কিছুই বুঝতে পারবে বলে আমরা মনে করি না। তিনি লিখেছেন-

"২০০৩ সালের রমযান মাসে যদি চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ উভয়ই সংঘটিত হয় তবে আমরা প্রত্যাশিত মহান ব্যক্তির আগমনের অপেক্ষায় থাকতে পারি। অন্যথায় উপরের বর্ণিত সকল অনুমানই মিথ্যা হবে। তাছাড়া ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত ইঙ্গিত সুনির্দিষ্ট করে বলার নিয়ম শরীয়তে না থাকায় এসবই অস্পষ্ট ঢাকা। গণনা, আন্দাজ বা উন্মোচনে যতটুকু পাওয়া যায় তা হাদিসের আলোকে হিসেব করে আমরা যদি কিছু বুঝার চেষ্টা করি সেটা এক ধরনের সান্ত্বনা বা ধারণা মাত্র। এ প্রসঙ্গে নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালাই ভাল জানেন।"

বিষয়টি পুরো হয়ে গিয়ে না থাকলে আমরাও ডক্টর সাহেবের মত একটা সান্ত্বনা নিয়ে বসে থাকতে পারতাম। যেহেতু বিষয়টি পূর্ণ হয়ে গেছে তাই জনগণের জ্ঞাতার্থে উক্ত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত হাদীসটি আর এর ব্যাখ্যা প্রকাশ করছি। ডক্টর সাহেবদের যদি খোদার ভয় থেকে থাকে তাহলে তারা বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবেন। প্রসঙ্গতঃ এ হাদীসের বিষয়-বস্তু যখন তাঁর দাবীর স্বপক্ষে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো তখন তিনি সারা বিশ্ববাসীকে তাঁর এক কবিতার মাধ্যমে জানিয়েছিলেন ঃ

"ইয়ারো জো মরদ আনে কো থা ওহ্ তো আ চুকা।

ইয়েহ রায তুম কো শামস্ও কৃমর ভী বাতা চুকা"

অর্থাৎ, যে বন্ধুগণ! যে মহাপুরুষের আসার কথা ছিলো সে তো এসে গেছে

এর রহস্য তোমাদেরকে সূর্য ও চন্দ্র বলে দিয়েছে॥ (দুররে সামীন)

ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সত্যতার মহাকাশীয় নিদর্শন চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ

কুরআন ঃ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

অর্থঃ এবং চন্দ্র ও সূর্য উভয়কে (গ্রহণে) একত্র করা হবে (সূরা ক্বিয়ামা ঃ ১০)

হাদীস ঃ

إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ -
(دار قطنى)

অর্থ ঃ "আমাদের মাহ্দীর সত্যতার দু'টি নিদর্শন আছে। আর যখন থেকে খোদাতাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ দু'টি নিদর্শন কারও জন্যে প্রদর্শন করেন নি। এর মাঝে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহ্দীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, এ রমযান মাসেই সূর্যগ্রহণের তারিখগুলোর (২৭, ২৮ ও ২৯) মধ্যম তারিখে অর্থাৎ ২৮ তারিখে গ্রহণ লাগবে।"

(সুনানে দারে কুতনী, বাবু সিফাতে সালাতিল খুসুফে ওয়াল কুসূফে ওয়া যাহায়াতেহিমা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮, মুদ্রাকর আনসারী ছাপাখানা, দিল্লী)।

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী, হযরত ইমাম মুহাম্মাদ বাকের (রাঃ) নামে পরিচিত। তিনি হযরত ইমাম আলী যয়েনুল আবেদীন (রাঃ)-এর পুত্র এবং হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর পৌত্র ছিলেন। হাদীসকে আল্লামা কুরতুবী তাযকিরাতে, আল্লামা জালাল উদ্দীন সাইউতী আল্ হাবী ও আল্লামা ইবনে হাজর হাশিমী আল্ কওলুল মুখতাসির এ বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে কয়েকজন পূর্ববর্তী আলেমও বর্ণনা করেছেন। শিয়াপন্থী আলেমগণও এ হাদীস সম্বন্ধে ঐকমত্য রয়েছেন (তফসীরে সাফী, প্রথম খন্ড, তেহরান, ফিতার ফোরশী ইসলামীয়া, পৃষ্ঠা-৭৬৫)।

হাদীসের শব্দে আওওয়ালে লায়লাতিন-এর অর্থ এটা হতে পারে না যে, রমযানের প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। কেননা, প্রথম রাত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী গ্রহণ লাগতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম রাত্রের চাঁদকে আরবীতে 'হেলাল' বলে। কিন্তু হাদীসে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'কমর'। তৃতীয় রাত্রের পরে চাঁদকে 'কমর' বলে (আল্ মুনজিদ নামক অভিধান দেখুন)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ হাদীসের কয়েকটি দিক ঃ

১। চন্দ্র গ্রহণের নির্ধারিত তারিখগুলোর মাঝে প্রথম রাত্রে অর্থাৎ ১৩ তারিখ রাতে গ্রহণ লাগবে।

২। সূর্য গ্রহণের নির্ধারিত দিনগুলোর মধবর্তী দিনে অর্থাৎ ২৮ তারিখ দিনে গ্রহণ লাগবে।

৩। উভয় গ্রহণই একই রমযান মাসে সংঘটিত হবে।

৪। একজন মাহ্দীর দাবীদারের উপস্থিতিতে তাঁর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ এ গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হবে।

[বিস্তারিত জানার জন্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর 'তোহ্ফা গেলড়াবিয়া' পুস্তকের ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠে এবং গ্রহণের তারিখগুলো দৃষ্টে জানা যায় যে, রমযান মাসে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কখনও এসব নির্ধারিত তারিখে এ ধরনের সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় নি যাতে কোন দাবীকারক স্বীয় সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এগুলোকে উপস্থাপন করেছেন।

এমন ঘটনা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম সংঘটিত হয় যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম মাহ্দীর দাবীদার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর সে সময় তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন মাহ্দীর দাবীদার পৃথিবীতে উপস্থিত ছিল না। ১৮৯৪ সনের ২৩শে মার্চ এ চন্দ্রগ্রহণের এবং ৬ই এপ্রিল সূর্য গ্রহণের নিদর্শন পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে দেখানো হয় (আযাদ, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৪, মিলিটারী গেজেট, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪ দ্রষ্টব্য)। এসব শর্তানুযায়ী পরবর্তী বছর রযমান মাসেই দ্বিতীয় বার চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আর পশ্চিম গোলার্ধের লোকেরা এ দৃশ্য অবলোকন করে।

খোদাতাআলা স্বীয় কর্মকান্ড দ্বারা সাক্ষ্য দিলেন ও নির্ধারিত দিনে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে,

১। আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য এবং চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একজন নিরক্ষর ব্যক্তি অদৃশ্যের এমন সংবাদ নিজের পক্ষ থেকে তৈরী করে বলতে পারেন না। এটা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ হুযূর (সঃ)-এর সত্যতারও একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

২। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) স্বীয় দাবীতে নিষ্ঠাবান ও প্রকৃতই সেই মাহ্দী যাঁর সম্বন্ধে হযরত রসূলে করীম (সঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন। কেননা, কোন মিথ্যা মাহ্দী সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগতে পারে না। মহাকাশীয় সত্তাগুলোর ওপরেও তাঁর কোন হাত নেই।

-নির্বাহী সম্পাদক

২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী বিশেষ সংখ্যা

পাক্ষিক আহমদী'র গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে

- আগামী ৩০শে জুন, ২০০৩ পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার বর্তমান, (২০০২-২০০৩) বছর শেষ হতে যাচ্ছে। সুতরাং গ্রাহকগণকে যথা সময়ে চাঁদা আদায় করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
- যাদের চাঁদা ২ বছরের অধিক বকেয়া রয়েছে তাদের নামে ৩০শে এপ্রিল, ২০০৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকা পাঠানো বন্ধ করা হয়েছে। সুতরাং তাদেরকেও যথাসময়ে বকেয়া সহ চাঁদা আদায় করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- পাক্ষিক আহমদীর ৩০ এপ্রিল ২০০৩-এর সংখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর ইনতেকালের ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বর্ধিত কলেবরে সুদৃশ্য ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে। এর স্টক অতি দ্রুত নিঃশেষ হওয়ায় আমরা নতুন ক্রেতা বা গ্রাহকদের দিতে না পারায় দুঃখিত। তবে জামাতগুলো থেকে প্রতি কপির মূল্য টাকা ২০/= হিসেবে চাহিদাপত্র পাঠালে আমরা এ সংখ্যা পুনঃ মুদ্রণের চেষ্টা করতে পারি। তাই স্থানীয় জামাতের এবং অঙ্গ-সংগঠনসমূহের কর্মকর্তাগণকে এ প্রসঙ্গে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আগামী ৩১শে মে, ২০০৩-এর মধ্যে চাহিদাপত্র আমাদের নিকট আসা আবশ্যক।

লেখক-লেখিকাদের দৃষ্টি পুনঃ আকর্ষণ করা যাচ্ছে ঃ

- লেখা-কাল কালিতে ফুল স্ক্যাপ সাইজের কাগজের এক পিঠে লিখতে হবে।
- লেখা বিষয়-ভিত্তিক ও নাতিদীর্ঘ হতে হবে।
- আরবী উর্দূ উদ্ধৃতি সঠিক জানা না থাকলে শুধু সূত্র সহ অনুবাদ দিবেন।

পর্দা প্রগতির দিশারী

(১০ম কিস্তি)

এ প্রসঙ্গে আধুনিক বিশ্ব মানবতার শান্তি-দূত হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর বর্ণিত একটি দৃষ্টান্ত খুবই প্রণিধানযোগ্য। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, "একটি মজার কথা আমার মনে পড়লো। কথাটা শুনে হয়তো অনেকেই হাসবেন, তবে অনেকের চোখে পানিও আসতে পারে। একটা বাচ্চা ছেলে তার দাদার প্রতি তার পিতার দুর্ব্যবহার দেখে মনে মনে খুব দুঃখ ও অস্বস্তিবোধ করতো। সে প্রথমে একবার দেখলো যে, তার পিতা তার দাদাকে একটা ভাল আরামদায়ক কক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা কম আরামদায়ক কামরায় থাকতে দিল। এবং এমনিভাবে, একটার পর একটা কামরা বদলাতে বদলাতে অবশেষে তার দাদাকে চাকর-বাকরদের ঘরে একটা জায়গা করে দিল। একবার প্রচন্ড শীতের মৌসুমে তার দাদা তার কষ্ট ও অসুবিধার কথা জানিয়ে বলেন, এ কামরাটা তো ভীষণ ঠান্ডা। তাছাড়া তার কাছে তো তেমন লেপ-কাঁথাও নেই, সে থাকবে কী করে। এতে, ছেলেটির পিতা পুরাতন ছেঁড়া-ফাড়া কাপড়ের একটা বোচ্কা খুলে খুঁজতে লাগল, কোন কম্বল-টম্বল পাওয়া যায় কিনা। অবস্থাটা দেখে ছেলেটি তার বাবার কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে বললো, "বাবা গো! সব ছেঁড়া-ফাড়া কাপড়গুলোই দাদাকে দিও না কিন্তু, আমার জন্য কিছু রেখে দিও, যখন তুমি বুড়ো হবে নইলে আমি আবার তোমাকে দিব কী!' বলাই বাহুল্য বাচ্চাটার অসন্তোষের এ নির্দোষ প্রকাশের মাঝ দিয়েই ফুটে উঠেছে বর্তমান যামানার বয়ঃবৃদ্ধ প্রজন্মের দুঃসহ দুঃখ আর মর্মবেদনা" (বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩)।

বর্তমান বিশ্ব মানবতার এ দুর্গতি হতে গতির প্রেক্ষাপটে বিয়ের মাধ্যমে যৌনজীবনকে সংযত রাখা এবং আজীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একনিষ্ঠ প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার অকৃত্রিম সেতু-বন্ধন গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর তা যথার্থভাবে পালনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ইসলামী পর্দার বিধানের আলোকে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আবশ্যক। কেননা নারী-পুরুষের লাগামহীন চলাফেরার সুযোগ থাকলে দাম্পত্য জীবনের ভীত নড়বড়ে হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। উপরন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচ্চরিত্রবান সুসভ্য উত্তম মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য জন্মের পর হ'তে তার প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা-মাতাকে বহন করা জরুরী। ফলে এসব সন্তানরা মাতাপিতার বৃদ্ধ বয়সে অসহায়ত্ব অবস্থায় আন্তরিকভাবে উপযুক্ত সেবা-যত্ন করে থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের নির্দেশকে বলেন, "এবং তোমার প্রতিপালক তাকিদপূর্ণ এ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন যদি বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের উভয়কেই তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ও মমতাপূর্ণ কথা বলবে। তুমি মমতার সাথে তাদের ওপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখবে এবং বলবে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে রহম করো, যেভাবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন (আমার) ছোট বেলায়" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৪-২৫)।

হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, "মাতাপিতার খুশীতে আল্লাহ্ খুশী এবং মাতাপিতার অখুশীতে আল্লাহ্ অখুশী" (তিরমিযী)। সুতরাং ইসলাম একদিকে সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব অপর দিকে মাতাপিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সেবা-যত্নের দায়িত্ব, প্রকারান্তরে পরিবারের সবার মাঝে একের প্রতি অপরের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যথার্থ সুগভীর হৃদয়গ্রাহী প্রেম-বন্ধনের স্বর্গ-সুখের পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার বিধান দিয়েছে। আর তা অনুসরণেই বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী রাহু হতে মানব জাতির মুক্তি নিশ্চিত।

আধুনিক বিশ্বের প্রগতিবাদী মনীষীরা মানবজাতির এ অবক্ষয়ের ভয়াবহতা অনেকাংশে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্বব্যাপী অবক্ষয় হতে মানবজাতিকে উদ্ধার-কল্পে তারা সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। ফলে তাদের মাঝে অবক্ষয়মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন গড়া, মাতাপিতা কর্তৃক সন্তান প্রতিপালন এবং বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা-যত্নের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তার শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। তাদের মনীষী জ্যাকুয়াল মিলার বলেন, "প্রকৃতির প্রথম এবং প্রধান আইন হচ্ছে মাতাপিতাকে মান্য করা"। বিভিন্ন দেশের সরকার গণমাধ্যমে পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার গুরুত্ব আরোপ করছে। এমন কি জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতি বছর বিশ্ব পরিবার দিবস, বিশ্ব মা দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস ও বিশ্ব প্রধান হিতৈষী দিবস ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সুখী সমৃদ্ধিশালী পারিবারিক জীবন গড়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হচ্ছে। এটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আংশিক রূপ রেখা। কিন্তু দেহ অসুস্থ হলে যেমন সারা দেহের পূর্ণ আরোগ্যের উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হয় তেমনি সমাজ দেহের অবক্ষয়ের বিষক্রিয়ার পূর্ণ নিরাময়ের জন্য সর্বাংশের যথোপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। কেননা, অবক্ষয়ের বিষক্রিয়া একটি অপরটিকে সংক্রামিত করে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রগতির নামে নারী পুরুষের অবাধ যৌন-সম্ভোগ ও সমকামিতা প্রচলিত থাকায় এবং এর নিরাময়ের যথোপযুক্ত উদ্দেশ্যের অভাবে এর বিষক্রিয়ায় দাম্পত্য জীবনের ভীত প্রবৃত্তির মহা প্রলয়ে ভেঙ্গে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে জাতিসংঘ কর্তৃক পালিত বিশ্ব পরিবার দিবস, বিশ্ব মা দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস ও বিশ্ব প্রধান হিতৈষী দিবস এর শ্লোগান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। সকল প্রচেষ্টা বিফলে যাচ্ছে। কাজেই একে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যৌনজীবনকে সংযত রাখা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আর তার একমাত্র ব্যবস্থা পত্র হ'ল ইসলামী পর্দা প্রথা। পর্দার বিধানের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মুক্ত ও অবাধ মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রেক্ষিতে যৌন জীবনকে সংযত ও পবিত্র রাখার ফলে সুখী

সমৃদ্ধিশালী পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। কোন মানবীয় প্রচেষ্টায় নয়, ঐশী নির্দেশিত পথে তা অর্জন সুনিশ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান-পাপীদের বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন যে, অবাধ যৌনজীবন ও সমকামিতা মানবীয় গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য নয়। এ কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না। পাপাচার একটি অপরটিকে সংক্রামিত করে। ফলে তা জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হয়ে অচিরেই জীবনকে কলুষিত ও ধ্বংস করে। যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এ পরিলক্ষিত হয় তারা চরিত্রহীন, সভ্যতার কলঙ্ক ও বর্বর মানুষ। কেননা চরিত্র মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য তার চরিত্রগত সৌন্দর্যের উপর নির্ভরশীল। ইংরেজীতে বলা হয়- The crown and glory of life is character, চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি পরিস্ফুটিত হয়। চরিত্রহীন মানুষ পশু-তুল্য। তারা অবক্ষয়ে সর্বস্বান্ত ও সমাজে ঘৃণিত। জনৈক মনীষী বলেন ঃ

When money is lost, nothing is lost
When health is lost, someting is lost
When Character is lost, everything is lost

কাজেই প্রাচ্যের প্রগতিবাদী চরিত্রহীন সমাজের মানুষের জীবন আর্দশের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কখনও শুভ নয়। আল্লাহ্তাআলা বলেন, "তোমরা জালেমদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। তাহলে তোমাদেরকে দোযখের আগুন আক্রান্ত করবে" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)।

ধনী হওয়া ধনের ওপর নির্ভর করে না। ধনী হওয়া নির্ভর করে আত্মতৃপ্তির ওপর। কাজেই ধন-সম্পদে ঐশ্বর্যশালী মানুষ বড় নয়। নৈতিক চেতনায় বলিয়ান এবং মানবিক মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত মানুষই বড়। আল্লাহ্তাআলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সে-ই বেশি সম্মানীত যে বেশি তাকওয়াপরায়ণ" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৪)। শেখ সাদীর ভাষায়, "ভদ্রলোক সে-ই বড় লোক সে-ই যে সত্যের উপাসক।" চরিত্রবান ধার্মিক ব্যক্তিই আদর্শ ও বড়ত্বের মাপকাঠিতে মর্যাদার অধিকারী। কাজেই দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য। তারা আত্মশুদ্ধির জ্ঞানে জ্ঞানী নয়। তারা আত্ম কলুষিতের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। মণি লাভের নিমিত্তে বিষধর সর্পের সহচারী হলে যেমন সর্প দংশন সম্ভাব্য তেমনি চরিত্রহীন মানুষের জীবনাদর্শে নিরংঙ্কুশ পুতঃপবিত্র জীবনের ধ্বংস অনিবার্য। কেননা বিদ্যা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ হলেও চরিত্র বিদ্যার চেয়েও সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। কাজেই চরিত্রহীন মানুষের বিষক্রিয়ার সক্রামণ হতে রক্ষার প্রতিষেধক পর্দা পালন অপরিহার্য।

ইসলামী মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তারা পর্দা প্রথাকে প্রগতির অন্তরায় বলে সমালোচনা করে। কিন্তু পর্দা প্রথা প্রকৃতপক্ষে প্রগতির অন্তরায় নয়। প্রগতির দিশারী হিসাবে ভূমিকা রাখে। কেননা প্রগতির মূল উদ্দেশ্য মানব জীবনকে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সুন্দরের পক্ষে ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মানব কল্যাণে মানব মনের প্রশান্তি বৃদ্ধি করা। জীবনকে প্রাণবন্ত করা। যে কাজের অগ্রগতিতে মানবিক মূল্যবোধ ও মানব মনের প্রশান্তি এবং সামাজিক শৃংখলা বৃদ্ধি হয় না তা প্রগতি নয়। তা প্রগতির নামে দুর্গতি। আধুনিক বিশ্ব মানবীয় প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিহরণ জাগানো বস্তুগত উন্নতির ফলে মানবজীবন অনেক বিসালবহুল ও আনন্দঘন হলেও মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের গুণাবলীর বিকাশের অভাবে মানব জীবনে কল্যাণ তথা প্রকৃত সুখ ও মানসিক প্রশান্তি বৃদ্ধি হয় নি। অথচ শান্তির প্রত্যাশা মানুষের সহজাত প্রবণতা। জীবনের সাধনা ও বেঁচে থাকার অবলম্বন। কিন্তু আধুনিক প্রগতি শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবজীবনকে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে গড়ে তুলতে পারে নি। মানুষকে আত্ম-দর্শনের পথ প্রদর্শনে আত্মশুদ্ধি করতে ব্যর্থ। বরং অবক্ষয়ের কড়াল কবলে নিক্ষেপ করেছে। প্রগতির গতির সাথে মানব জীবনের প্রশান্তির গতির সঞ্চার হলে জীবন অনেক সুখের হতো। সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবে প্রধানত নারী-পুরুষের লাগামহীন মেলামেশার সুযোগে অবাধ যৌনাচারে নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের কারণে প্রগতি শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। তাই প্রগতির এ দুর্গতি হতে মানব সমাজকে উদ্ধার করে অবক্ষয়মুক্ত প্রগতিশীল সমাজ গড়ার লক্ষ্যে পর্দা প্রথা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নারী-পুরুষ উভয়ে পর্দার বিধান পালনের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিবেশে আধুনিক বিশ্বের মানব কল্যাণে উন্নয়নমূলক কর্ম-কান্ডে আত্মনিয়োগ করতে পারে। আর তাহলে নৈতিক অবক্ষয়মুক্ত প্রগতিশীল সুখী সমৃদ্ধিশীল প্রাণবন্ত অর্থবহ সার্থক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। প্রগতির গতির সাথে মানব মনের প্রশান্তির গতি সঞ্চারিত হবে।

বর্তমান বিশ্ব অবক্ষয়ের অন্তহীন অধোগতি হতে মানব জাতিকে উদ্ধারকল্পে বিশ্বের শান্তি দাতা আল্লাহ্তাআলা তার প্রেরিত প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ব-শান্তির পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর (আঃ) অনুগমনে ইসলামের পুনঃ জাগরণে বিশ্ব-শান্তি অন্তর্নিহিত কোন মানবীয় প্রচেষ্টায় অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলা যায়, "সত্য এসে গেছে, মিথ্যা পালিয়েছে এবং মিথ্যা নিশ্চয় বিলীন হওয়ারই যোগ্য (বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)। জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন ঐশী খিলাফতের আলোকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবক্ষয়মুক্ত বিশ্ব গড়ে উঠবে। সুতরাং বিশ্ব শান্তির একমাত্র পথ, ঐশী খিলাফত। (চলবে)

- মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল

আতফাল দিবস পালিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নিউ সোনাতলার উদ্যোগে গত ২/৫/০৩ইং আতফাল দিবস পালিত হয়, আল্ হামদুলিল্লাহ্। বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বেশ কয়েকটি খেলার আইটেম থাকে এবং দীনি মা'লুমাত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। জুমুআর নামাযের পর স্থানীয় কায়েদ জনাব মহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের নসিহতমূলক বক্তৃতা ও স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম এবং খাকসারের নসিহতমূলক বক্তৃতার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়।

- মোঃ মহিদুল ইসলাম, কায়েদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
নিউ সোনাতলা।

পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীনের অভিমত ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব

মসীহ্ মাওউদ দিবস সম্পর্কে জানতে হ'লে আমাদের প্রথমে জানা দরকার মসীহ্ কী? মসীহ্ হলো সংস্কারক যিনি পরিষ্কার করেন, ধুয়ে মুছে সাফ করেন, যিনি মুছে দেন যতসব মন্দ আর পঙ্কিলতা। আর 'মাওউদ' হলো প্রতিশ্রুত বা ওয়াদাকৃত যাঁর আগমনের ওয়াদা ছিল বা প্রতিশ্রুতি ছিল।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর ওপর সর্বসম্মতিক্রমে মুসলিম উম্মতের ওলী, দরবেশ ও আলেমগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কারণ তাদের কাশ্‌ফ (দিব্য-দৃষ্টি) রুইয়া (সত্য-স্বপ্ন) ও ইলহামের (ঐশী-বাণী) ইঙ্গিত এ ছিল যে, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে সেই মহান পুরুষ আবির্ভূত হবেন যাঁকে হাদীসের গ্রন্থে মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ) উপাধি দেয়া হয়েছে। যেমন; **'ওয়া লাল মাহ্‌দীয়ু ইল্লা ঈসাইবনে মারইয়ামা'**- অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহ্‌দী নেই (ইবনে মাজাহ্ ফী শিদ্দাতুজ্জামান)

তাই বুযুর্গানে উম্মতের মাঝে উক্ত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায় ঃ

* হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এ হাদীস [আন আবী কাতাদাতা ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্ আয়াতু বায়দাল মিয়াতায়নে।"

অর্থ ঃ আবূ কাদাতাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নির্দিষ্ট লক্ষণসমূহ দুই শ' বছর পর প্রকাশিত হবে" (আল্ মিশকাত, কিতাবুল ফিতন)]

এর সমর্থনে - আইয়া বা'য়াদাল মিয়াতাইনে বায়া'দাল আলফে ওয়াহুয়াল ওয়াক্‌তুলি জহুরিল মাহ্‌দিয়ূ।"

অর্থ ঃ সেই দু'শ' বছর পর যা হাজার বছর পর আসবে তা-ই ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জাহির হওয়ার সময়" (মিরকাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫, শরহে মিশকাত, পৃষ্ঠা ২৭)

এখানে আমরা মনোযোগ দিলে দেখতে পাই হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ) সাহেব হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাদীস যা আবূ কাতাদা বর্ণিত দু'শ' বছর পরে আসবে তার সুন্দর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন যে, এ দু'শ' বছর এক হাজার বছর পর হবে। এটাও সূরা আস্ সিজদা- ৬ আয়াত সমর্থিত। কুরআন শরীফে সূরা আস্ সিজদার আয়াত-৬ এ আছে - 'ইউদাব্বিরুল আমরা মিনাস্‌সামায়ি ইলাল আরযি সুম্মা ইয়া'রুজু ইলায়হি ফি ইয়াওমি কানা মিকদারুহু আলফা সানাতিন্ মিম্মা তাউদ্দুন।"

অর্থ ঃ তিনি আকাশ থেকে পৃথিবীতে হুকুম প্রবর্তন করেন, অতঃপর এ তাঁর দিকে উঠে যাবে একদিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনামতে এক হাজার বছর।"

সুতরাং এ হিসাব মতে ইমাম মাহাদী (আঃ)-এর জাহির হওয়া (১০০০+২০০)=১২০০ হিজরীর পর। আবু কাতাদার বর্ণিত হাদীস মতে ১২০০ হিজরী থেকে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে।

'আল্ নাজমুস্ সাকিব' গ্রন্থে উক্ত বিষয়টি সময় উল্লেখপূর্বক আরো সুন্দর করে একটি হাদীস উল্লেখ করে বর্ণিত হয়েছে-

'আন্ হুযায়ফাতা ইবনে ইয়ামানিন ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইযা মাযাত আলফুন ওয়া মিয়াতায়নে ওয়া আরবাউনা সানাতান ইয়াবয়াসুল্লাহুল মাহ্‌দীয়া।"

অর্থ ঃ হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামিন হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ১২৪০ বৎসর অতিক্রান্ত হবে তখন আল্লাহ্‌তাআলা ইমাম মাহাদীকে পাঠাবেন" (আন্ নাজমুস সাকিব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-২০৯)।

এ হাদীস থেকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দুনিয়াতে আগমনের সময় ১২৪০ হিজরী সনের পর বলা হয়েছে।

* হযরত আল্লামা শা'রানী লিখেছেন, "ইমাম মাহাদী (আঃ) হিজরী ১২৫০ সনের ১৫ই শা'বান জন্মগ্রহণ করবেন" [আল ইয়াকীতু ওয়াল জাওয়াহের, নুরুল আবসার ফি মানাকিবে আলে বাইতিন্ নবীয়ে (সঃ) গ্রন্থে] পূর্ববর্তী মতামতের ভিত্তিতে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জন্ম তারিখ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন আল্লামা শা'রানী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে। প্রকাশ থাকে যে, হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) তাঁর প্রণীত ফসূসুল হিকাম গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ভগ্নীসহ যমজ জন্মগ্রহণ করবেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ্‌তাআলার নেক, ওলী, আবদাল বান্দাগণের সুতীক্ষ্ণ গবেষণা কীভাবে বাস্তব লাভ করেছেন ভাবলে অবাক হতে হয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ১২৫০ হিজরী সনে ১৫ শাওয়াল তারিখে শুক্রবার এক ভগ্নীসহ যমজ জন্মগ্রহণ করেন (আল্‌হামদুলিল্লাহ্)।

হযরত আল্লামা শা'রানী (রহঃ) ১৫ শাওয়াল স্থলে ১৫ শাবান-এর কথা লিখেছিলেন। এটা স্বাভাবিক দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে এরূপ সূক্ষ্ম ত্রুটি সংযুক্ত থাকা তেমন ধর্তব্য বিষয় নয় যেখানে সন, তারিখ, যমজ জন্মগ্রহণ তা-ও আবার ভগ্নীসহ মিলে গেছে সেখানে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলাই শ্রেয়।

* আল্লামা নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ ভূপালী ১২৯১ হিজরী সনে তার এক গ্রন্থে লিখেন; চতুর্দশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পথে পূর্ণ ১০ বছর অবশিষ্ট আছে। যদি মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইতোমধ্যে জাহির হন তাহলে তিনি হবেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ" (হুজাকূল কিরামাহ্, পৃষ্ঠা ১৩৯)।

* হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব হিজরী ১২৯১ সনে সংঘটিত হবে" (ফসূসুল হিকাম, মুকাদ্দমা ইবনে খলদুন, পৃষ্ঠা ৩৬৪)।

আল্লাহতাআলার ওয়াদা অনুযায়ী বুযূর্গানে উম্মতের অভিমত মিলে গিয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হিজরী ১২৯১ সনে মুজাদ্দিদরূপে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হন।

* আল্লামা নওয়াব আবুল খায়ের নূরুল হাসান খাঁ হিজরী ১৩০১ সনে তদীয় গ্রন্থে লিখেছেন "... হয়ত আল্লাহ্‌তাআলা আপন ফযল ও আদল এবং রহম ও করম বর্ষণ করবেন আর

চার / ছয় বছরের মধ্যেই মাহ্দী (আঃ) আবির্ভূত হয়ে যাবেন" (ইকতিরাবুস সায়া, ২২১ পৃষ্ঠা)

সত্যিই অপূর্ব! আল্লাহ্তাআলা রহম ও করম করেছেন। তাই তিনি হিজরী ১৩০৬ সনে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহাদী (আঃ)-কে প্রত্যাদিষ্ট করে ইসলামের সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করলেন।

ইংরেজী সন গণনা হিসাবে ১৮৮৯ইং এর ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়ে ভারতের লুধিয়ানায় হযরত সুফী আহমদ জান সাহেবের বাসায় বয়াত গ্রহণকার্য শুরু করেন। এ বয়াত গ্রহণ থেকে জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয় মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অনুসারীর মাধ্যমে। এ বয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথমে পুরুষদের বয়াত নেয়া হয় এরপরে মহিলাদের। হুযূর (আঃ)-এর হাতে সেদিন ৪০ জন বয়াত নেন, প্রথম বয়াত গ্রহণকারীগণের মধ্যে ছিলেন সর্বজনাব হযরত মওলানা হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ), হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানোরী (রাঃ), হযরত হাফেয হামিদ আলী (রাঃ), হযরত মুন্সী অরোড়ে খাঁ (রাঃ), হযরত মুন্সী জাফর আহমদ (রাঃ), হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রাঃ), হযরত মওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রাঃ), হযরত শেখ ইয়াকুব আলী তুরাব সাহেব (রাঃ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

এ বয়াত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কিত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। আর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ চাতক পাখির ন্যায় আকাশ পানে চেয়ে থাকার প্রতীক্ষারও শেষ হয়। তাই এ দিবসটি এমন একটি দিবস যা মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে স্মরণীয় ও বরণীয়। জামাতে আহমদীয়া ২৩শে মার্চ দিবসটিকে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস হিসাবে পালন করে আসছে এক শতাব্দী কাল ধরে। ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবসের প্রাক্কালে তাই আমাদের প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত, "হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বয়াতের দশটি শর্ত সযত্নে পালন করতে সর্বদা চেষ্টা করিব। ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির উপরে অগ্রাধিকার প্রদান করিব। আহমদীয়া খেলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করিব ...।" (বয়াতের আবেদন)।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে এর তৌফীক দিন, আমীন।

- এনামুল হক রনি
মোয়াল্লেম

উওহ্ বাদশাহ্ আয়া

আসলেন-জয় করলেন-চলে গেলেন! সেই বীরপুরুষ-যাঁর হাতে কোন অস্ত্র নেই, যিনি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ক্ষমতার অধিকারী নন, অথচ জামাতে আহমদীয়াকে ইলেকট্রনিক বিপ্লব দিয়েছেন, মোবাহালায় ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনায়ককে পরাস্ত করেছেন, কোটি কোটি বয়াতের ঝড় তুলেছেন, আধ্যাত্মিক সেনাদল (ওয়াক্ফে নও) কায়েম করেছেন, তিনি মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের ছেড়ে প্রিয় প্রভুর দরবারে চলে গেলেন গত ১৯শে এপ্রিল '০৩। এত বিনয় এত হাস্যোজ্জ্বল, এমন জ্ঞানী এক কথায় যাকে সাগর বললেও কম বলা হবে। এক অনুষ্ঠানে যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনার খিলাফতকালের কাজগুলোর মাঝে কোন্টি আপনার সবচেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- "মূসা (আঃ)-এর একটি দোয়া আমার সবচেয়ে প্রিয়। দোয়াটি হচ্ছে **রব্বি ইন্নী লিমা আনযালতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাকির**- অর্থাৎ হে আল্লাহ্! যেকোন কল্যাণ আমাকে দান কর, নিশ্চয় আমি উহারই ভিখারী।" ১৮ই এপ্রিল '০৩ শেষ অনুষ্ঠান মজলিসে ইরফানে একটি প্রশ্নের উত্তর (যা পূর্বের কোন অনুষ্ঠানে দিয়েছিলেন) সংশোধন করে বলেন- 'আমি সবার সামনে স্বীকার করছি আমি ভুল বলেছিলাম। এখন সঠিক রেওয়ায়াতগুলো শুনুন" - এ কথার দ্বারা এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আর বিনয়ের এমন চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন যা সত্যিই জগতে দুর্লভ! একটা মানুষ সাড়া দুনিয়ার সংশোধনের জন্য সারা জীবন কেঁদেছেন। আর দুনিয়া তাঁকে চিনতে পারে নি। জামাতের প্রতিটি মানুষের জন্য তিনি সমানভাবে ভেবেছেন। যখন কারো কষ্টের কথা তিনি শুনতেন মনে হতো তিনি যেন ভিতরে ভিতরে কাঁচের মতো ভেঙ্গে যাচ্ছেন। মোমের মত তিনি গলে যেতেন। প্রতিটি সদস্যের প্রতি তাঁর এ ভালবাসাই তাঁকে পিতার আসনে বসিয়েছে। তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণে আমাদেরকে পিতৃহীন করে দিয়েছেন। আমরা অনুভব করেছিলাম এতীম কাকে বলে? অসহায়ত্বের কয়েকটা দিন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছি, সম্মান এ অতিথিকে যেভাবে করা দরকার ছিল তা আমরা করতে পারি নি। আমার জীবনে এ মহান ব্যক্তিত্বকে দেখার অভিপ্রায় অপূর্ণই থেকে গেল। সেই পবিত্র অস্তিত্ব আমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে এ ধরাধাম হ'তে চলে গেলেন। হুযূর যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আমরা দোয়া করতেছিলাম হয়ত আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা খোদার কাছ থেকে তাঁর প্রিয় বান্দাকে বেশি দিন ধরে রাখতে পারি নি। হুযূর সুস্থ তো হয়েছিলেন কিন্তু সুস্থাবস্থায় আমাদেরকে একেবারেই প্রস্তুতি নেবার সুযোগ না দিয়ে জামাতকে হাসাতে হাসাতে (১৮ই এপ্রিলের মজলিসে ইরফানে সবাইকে খুব হাসিয়েছিলেন, নিজেও হেসেছিলেন) চলে গেলেন- একেবারে ফাঁকি দিয়ে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেও অশ্রুসিক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাতেই সন্তুষ্ট যাতে আমাদের খোদার সন্তুষ্টি। পবিত্র কুরআনের সেই বাণীই মনে পড়ে-

"কুল্লু মান আলায়হা ফান। ওয়া ইয়াবকা ওয়াজুহু রব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম" (সূরা রহমান)

অর্থাৎ "এর উপরে (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে) যা কিছু আছে সবই নশ্বর ক্ষয়শীল। এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।

যতদিন তাঁর হায়াত ছিল ততদিন তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন। তবুও ব্যথাতুর হৃদয়ে বিদায় দিতে হয়েছে, বিদায় দিয়েছিও।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইহধাম ত্যাগ করার পর হযরত উমর (রাঃ) যে তরবারী নিয়ে বলেছিলেন, যে বলবে মুহাম্মদ মারা গেছে তার শিরোচ্ছেদ করব। - এ ঘটনাটি আমরা মুসলমান মাত্রই কম বেশি জানি। কিন্তু এর অনুভূতি বা সে সময়কার পরিস্থিতি কেমন ছিল তা অনুধাবন করা সত্যিই মুশকিল। কিন্তু ইমাম মাহ্দীর হাতে বয়াতকারী আখেরীনরা এ ঘটনার কিছুটা আঁচ করতে পারে খলীফার মৃত্যুর পর। সেখানে একজন খলীফাতুল মসীহ্‌র মৃত্যুর পর এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র ও পরিপূর্ণ মানব ও নবীদের নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কী অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা একমাত্র ইমাম মাহ্দীর জামাতই বুঝতে পারে! আমরা আখেরীন হয়েও আউয়ালীনদের অবস্থা যেন আমাদের চোখের সামনে দেখতে পেলাম। আমরা শুধু এ আয়াতই পাঠ করি-

"হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা!

তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি (তাঁর প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও (তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট।

সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর।

এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে।" (৮৯ঃ২৯-৩১)।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) যখন অসুস্থ হয়েছিলেন তখন একটি নযম লিখেছিলাম। আজ তা উল্লেখ করে দিচ্ছি ঃ

স্পন্দনে তব বেঁচে থাকি মোরা তুমি আমাদের প্রাণ
তোমার তরে খোদার ঘরে দোয়া করি অবিরাম (।)
পিতার মতন ছায়া দিয়ে তুমি
রেখেছো নিশিদিন,
তোমার বিরহে বাজবে কি গো
আমাদের প্রাণবীন।
হেরিয়া তোমায় পাইলাম মোরা এতদিন যে গান
তোমার হাতে হাত দিয়া মোরা ঈমানকে সঁপিলাম (।)
আমাদের সুখে আমাদের দুঃখে
তুমিই আমার তরী,
তোমার আদেশে উঠি বসি মোরা
সবাইতো তোমারে হেরি।
তোমারে দেখিতে দু'নয়ন ভরে কত আশা পুষিলাম
মোদেরে ছাড়িয়া যাবে কিহে তাহে জগতের ঘনশ্যাম (।)
দু'হাত মোদের এলাহীর ঘরে
তুলে দিয়ে দোয়া করি,
তাঁহার জীবন বখশ্ হে খোদা!
আমাদের প্রাণ হরি।
বাদল দিনে আশা তুমি তাহের আহমদ তব নাম
তোমার তরে জান কোরবান, পবিত্র যে পরিণাম (।)
মুখালেফাতের ঝড়ের দিনেও
খড়ার দিনেও তুমি,
তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিয়া
খোদার রাহেতে আমি
বিচলিত হই, পেয়ে হারানোর ব্যথা বাজে অবিরাম
মসীহ্ পাকের খলীফা তুমি তুলেছ জগৎ ধাম (।)
ইসলাম নামী মেয়খানাতে
শরাবে খোদার নাম,
সাকী সে মসীহ্; বিতরণ ক'রে
মুহাম্মাদী সে জাম।
সেই পানশালা আজিকে আবার পসরার গুলফাম
মুসাফির মোরা দিয়াছ তুমি পিয়াসার আঞ্জাম (।)

আমার দুর্ভাগ্য, এ মহান ব্যক্তিত্বকে দেখার সাধ আমার অপূর্ণই রয়ে গেল। পরজগতে যেন খোদা আমার এ সাধ পূরণ করে দেন সেজন্য দোয়া করছি। আল্লাহ্ আমাদের সবার সহায় হউন।

সে সময়টা আমার সরাইলে থাকার কথা। সরাইলে MTA দেখার সুযোগ নেই। তাছাড়া কেন্দ্রের সাথেতো আর অন্য কোন ব্যবস্থাপনার তুলনা হতে পারে না। MTA -তে আমার ও তৌফিকের ১৯শে এপ্রিল '০৩ রেকর্ডিং থাকায় আমরা সেদিন বিকালের দিকে বকশীবাজার দারুত তবলীগে উপস্থিত হই। এরই মাঝে MTA -তে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা লেখা দেখতে পাই। আমরা স্টুডিওতে যে তিন চারজন ছিলাম তারা সবাই TV -সেটের সামনে মনযোগ আবদ্ধ করি। জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর সংবাদ পেলাম। হুযূর মারা গেছেন। দারুত তবলীগে হুলস্থুল পড়ে গেল। আমি এমন লোককেও কাঁদতে দেখেছি- যিনি তাঁর পিতার মৃত্যুতেও এভাবে কাঁদেন নি। আমাদের তো সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তৌফিক বলেছিল, আমরা তো কাঁদছি, কিন্তু ফিরিশ্‌তারা হাসছে। তারা অনেকদিন পর এমন একটা পবিত্র আত্মা পেয়েছে।"

সেদিন থেকে তাহাজ্জুদ নামাযের প্রোগ্রাম ঘোষিত হল। ন্যাশনাল আমীর সাহেব জরুরী সভায় বসেন। লঙ্গর চালু হয়। নানাদিক হতে টেলিফোন, লোকজনের সমাগমে দারুত তবলীগে বেদনাদায়ক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রোযা রাখার তাহরীক করা হয়। সবাই দোয়ায় মশগুল হয়ে যায়। জামাতে আহমদীয়াতো কোন দিন অভিভাবকহীন হয় নি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে কখনো বন্ধুহীন ও অভিভাবকহীন অবস্থায় রাখবেন না। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি একশ'রও অধিক বছরের নেয়ামতে পূর্ণ ছিল।

পরে জানতে পারলাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ খামেস নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথমে তাঁর হাতে নির্বাচকমন্ডলী সবাই বয়াত করেন। এরপর আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব ঘোষণা করেন, "খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর গঠিত নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে শূরা চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেবকে সভাপতি নির্বাচন করে। এবং শূরা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস নির্বাচন করেন এবং সবাই তাঁর হাতে প্রথমেই বয়াত করে নেন"।

আমাদের বাদশাহ্ এসেছেন। নতুন খলীফা- নতুন আকাশ- নতুন যমীন- নতুন সভ্যতা। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি দয়া বর্ষণ অনন্তকাল ধরে করতে থাকুন। আমীন, উর্দূ কবি ওবায়দুল্লাহ্ আলীমের ভাষায় বলবো -

"উহ্ আরাহে হে যামানে কে তোম ভি দেখোগে
খোদাকে হাত ছে ইনসান কো বাদালতে হুয়ে।"

- মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব (জয়)

দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন যাপনে ডায়েট ঠিক রাখুন

আমি আজ যা লিখতে বসেছি তার প্রতিটি বাক্যই হবে বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ। আর উপদেশ শুনতে কেউ পসন্দ করে না। কিন্তু জনেন তো আমাদের জীবনটাই চলছে বিভিন্ন উপদেশ ও নীতি-কথাকে কেন্দ্র করে। যে যত বেশি উপদেশ ও নীতিকথা মেনে চলতে পারে তার চলার পথ হয় তত সুপ্রশস্ত। সব সময়ই সে জয়ী হয়। বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট ছোট একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে আমি মূল বক্তব্যে ফিরে যাব।

কিছুদিন আগে আমার বড় মেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে একটি বৌ-ভাতের দাওয়াতে অংশ-গ্রহণ করি। অনুষ্ঠানটি যদিও পারিবারিক নয় তবুও ওখানকার অনেকেই ছিলেন আমার পরিচিতা। সবাই বসলাম খাওয়া শুরু হবে। সকলের ভাবটা ছিল এরকম যে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য বাশীতে ফুঁ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বেলায় আমরা যেভাবে দৌড়ে গিয়ে মাঠের অপর পারে যেতাম জীবন বাজি রেখে ঠিক তেমনি। সবাই দৌড়ের জন্য প্রস্তুত মানে খাবারের জন্য এরই মধ্যে সকলের গন্তব্যের কাছেই যার যার গ্লাস বোরহানী রাইস ডিস্ ইত্যাদি নিয়ে আসছে। রোস্টের অপেক্ষায় সবাই তন্ময় হয়ে আছে, বাঁশীতে ফুঁ হয়ে গেল অর্থাৎ রোষ্ট চলে আসল। শুরু হলো প্রতিযোগিতা। তখন কারোর আর কোন খেয়াল নেই একটার পর একটা বিশেষ আইটেম আসছে আমরা গলধঃকরণ করে যাচ্ছি। আমি খুব করে আমার সামনের সারির দিকে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি রাখছিলাম, দেখলাম তার মাঝে দু'চারজন বলছেন ভাই বাটিতে সবই হাড় পড়েছে মাংস পাল্টিয়ে দিন, আবার বাটিতে শুধু ঝোল মাংস নেই বাটি পাল্টিয়ে দিন ইত্যাদি। এর মাঝে চারিদিকে ঝোল মাংস, হাড় রাইস ফেলে একাকার, প্রতিযোগিতায় কেউ হারতে রাজি নয়। কারো কারো কাপড়-চোপড় এলোমেলো হয়ে গেছে। শীতের দিন যদিও খুব গরমে কপালে চিকণ ঘাম দিয়েছে। সবাই যেন অস্থির টার্গেটে পৌছতে হবে। আবার কেউ বাটিতে হাত দিয়েই অপেক্ষাকৃত নরম মাংসটি খুঁজে প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছে। সবাই যেন খাওয়ার আদবটা খাওয়ার সময় ভুলে গিয়েছিল। খাওয়ার চাপে সকলেরই নাক দিয়ে পানি ঝড়ছে। বিশ্রীভাবে সকলেই নাক টানাটানি শুরু করেছে। কি অদ্ভুত মানসিকতা! তারপর শুরু হলো পান সুপরীর পালা। ওখানেও একই অবস্থা। এ দুরবস্থার আমি ২টি কারণ খুঁজে পেয়েছি। প্রথমটি হলো আমরা দাওয়াতে আসার সময় যে উপহারটা নিয়ে আসি সেটাকে হালাল করার, দ্বিতীয় হতে পারে আমরা খাওয়া সম্পর্কিত আদব-কায়দা হাদীস ও নীতি কথা যাই বলুন না কেন খাওয়ার সময় সব ভুলে যাই। কেননা, আমাদের এ সমাজে এ যুগে প্রায় অনেকের ঘরেই এ ধরনের খাবার তৈরী হয়ে থাকে। যাহোক যে কোন ভুলের কারণেই আমরা সকলে দ্রুত অসুস্থ ও মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি। ভুলেই যাচ্ছি আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "পেটের ১ তৃতীয়াংশ খালি রাখার জন্য"। খাদ্য খাদ্যের জন্য বাঁচার নয়। ভোজন বিলাসীদের প্রতি বিনীত অনুরোধ সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য যতটুকু খাওয়া প্রয়োজন ঠিক ততটুকু খাবার আপনি গ্রহণ করুন। আর বিয়ের বা যে কোন অনুষ্ঠানে অন্ততঃ একটি সব্জীর ব্যবস্থা রাখা জরুরী। চলুন আমরা এবার আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

ডায়েট বা পরিমিত ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত খাদ্য প্রণালী আজ দৈনন্দিন জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েই দাঁড়িয়েছে। আমরা যদিও মাছে-ভাতে বাঙ্গালী, তথাপি বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমাদের জীবন যাত্রার কেন্দ্রস্থলে খাদ্যাভাসের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের খাবারের মেনুতে চলে এসেছে মোঘলাই, বিরিয়ানী, চপ কাটলেট, রোষ্ট, বার্গার, পিজা আরও কী! যদিও এ খাবারগুলো আমাদের শরীরের জন্য প্রায় সব সবসময়ই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, তবুও এগুলোর আপ্যায়ন না পেলে যেন আমরা তৃপ্ত হই না এবং সম্মানের পাল্লাও ভারী হয় না। আহার্য বস্তুগুলো আদৌ পুষ্টিবহুল অথবা পুষ্টিহীন। স্বাস্থ্য রক্ষায় কতটুকু এর অবদান থাকতে পারে বা আদৌ পাকস্থলী সেটাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করবে কি না সেটাও আমাদের বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করি না। আজকাল উচ্চরক্তচাপ হৃদরোগ ঘরে ঘরে লেগেই আছে তা'ছাড়াও রয়েছে অসম্ভব মেদ-ভুঁড়ি, চর্বিযুক্ত থলথলে দেহ ইত্যাদি। ঘরে ঘরে চলছে বাজারের হিড়িক এখানে ও ফ্যাশন করে কেনাকাটা করার চলছে প্রতিযোগিতা। মাসিক বাজারে কে কত চর্বিওয়ালা মাংস, মুরগী, খাসী, খাসীর মগজ, গরুর কয়েকটি রান কিনেছে এগুলোর গল্প গৃহিণীদের কাছে শোনা যায় স্কুলের গেটে অফিস আদালতে মহিলাদের আড্ডায়। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গল্প করে মজাও পান তারা। আর যারা এর আওতাভুক্ত ছিলেন না তারাও কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের সমিতির সদস্য হন। সুবাদে নতুন সদস্যার কর্তা ব্যক্তিটি প্রয়োজনে লোন করে হলেও তার স্ত্রীকে খুশী করার জন্য বাজার থেকে ব্যাগ ভরে মেদ, চর্বি, হৃদরোগ ভুরি ও কোলেস্টরেল কিনে নিয়ে আসেন। তখনই তার গুণধর স্ত্রী নিজেকে একটা হাই স্টাটাসে পদার্পণ করেছেন বলে মনে করেন। তাদের গল্পে থাকে কার কতটুকু তৈল খরচ হয়। যে পরিমাণে যত বেশি বলবেন তার দিকে সবাই চোখ রেখে গল্পটি মনোযোগ দিয়ে শুনেন। বাসায় এসে ভদ্র মহিলার হাতের ভেনিটি ব্যাগটা রাখার আগেই শুরু হয়ে যাবে-আমি তো কেবল ২ ক্যান তৈল দিয়েই মাস চালাই অমুকের মায়ের লাগে ৪ ক্যান আর না, অনেক কষ্ট করেছি এ মাস থেকে ৩ ক্যান না দিলে মাস চলবে না ইত্যাদি।

আমি গ্রামের মেয়ে। গ্রামে একটা প্রবাদ আছে, "এক খাওয়ায় মরে আরেক খাওয়ায় তরে"। এখানে 'তরে' মানে পার হয় বা বেঁচে থাকে। খাবার যেমন দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ করে ঠিক তেমনি সঠিক খাবার নির্বাচন এবং যথার্থ পরিমাণে গ্রহণ করে আজীবনের মত

ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ অতিরিক্ত কোলেস্টরলের মত জটিল ব্যাধি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি। আমরা যারা শহুরে জীবন যাপন করি মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যন্ত সকলে যা খাচ্ছি তাতে বেশির ভাগই অকাল মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি। দামী খাবারের পুষ্টি বেশি এই আমাদের ধারণা মনে করে তৃপ্ত হই। যেহেতু গুণাগুণ বিচার না করে আমরা খাবার খাচ্ছি ফলে খাদ্য আমাদের শরীরের ক্ষয়পূরণের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, দেখা দেয় রোগ-শোক, অকাল বার্ধক্য। কর্ম-বিমুখতাসহ নানা ধরনের জটিলতা। এসব থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হলো খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন, ভারসাম্য রক্ষাকারী খাদ্য গ্রহণ আর এক কথায় একেই বলা হয় ডায়েট কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রিত খাবার গ্রহণ। আর প্রতিটি ডায়েটের লক্ষ্য হচ্ছে শৃঙ্খলার সাথে কর্মমুক্ত পদ্ধতিতে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বাড়তি ওজন কমানো। একই পোশাক যেমন সকলের জন্য মানান সই নয় ঠিক তেমনি একই ধরনের ডায়েট সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এর জন্য দরকার ব্যক্তির ওজন উচ্চতা বয়স কর্মক্ষেত্রের ধরন শারীরিক অবস্থা, জেনেটিক ব্যাপার ইত্যাদি। যেমন ধরুন- একজন শিশুর জন্য যে খাবার যে পরিমাণে প্রয়োজন একজন বৃদ্ধের জন্য সেটা ঠিক নয়। একজন অফিস কর্মচারী বা কর্মকর্তার যে পরিমাণে খাবার প্রয়োজন একজন রিকসা চালক বা দিন মজুরের সে পরিমাণে নয়। আবার একই বয়স ও পেশার পুরুষ ও মহিলারে খাবারের মেনুও এক রকম হতে পারে না। শারীরিক অবস্থা ভেদে একজন মহিলার খাবার গর্ভ ও প্রসূতিকালীন স্বাভাবিকের চেয়ে বৈচিত্রময় এবং পরিমাণে বেশি প্রয়োজন হয়। শারীরিক অসুস্থতার কারণেও খাবারের ধরনে বৈচিত্র ও পরিমাণে তারতম্য ঘটে। যারা কায়িক পরিশ্রম বেশি করেন তাদের প্রয়োজন বেশি শক্তিদায়ক খাবার। আর তারা হজমও করতে পারে বেশি। আমাদের যা দরকার তা হচ্ছে খাওয়ার অভ্যাস বদলানো। প্রকৃতিতে সবার জন্যই সব ধরনের পুষ্টিকর খাবার রয়েছে। শুধু প্রয়োজন আর্থিক অবস্থা ও শারীরিক অবস্থা ভেদে প্রয়োজনীয় খাদ্য চিনে নিয়ে সুষমভাবে তা গ্রহণ করা।

প্রত্যেক মহিলার জন্য দিনে ২০০০ থেকে ২২০০ ক্যালরি প্রয়োজন। পক্ষান্তরে পুরুষের জন্য প্রয়োজন ২২০০ থেকে ২৫০০ ক্যালরি। যদি পরিণত বয়সের কোন ব্যক্তি তার ওজন কমাতে চান তবে তার প্রতিদিন ১২০০ থেকে ১৪০০ ক্যালরির মধ্যেই আহার সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এখন আপনাকে তৎপর ও দৃঢ়চিত্ত হতে হবে এবং ঠিক করতে হবে আপনি নিজেকে কী পরিমাণ ক্যালরি গ্রহণের সুযোগ দিবেন। আপনাকে সব সময় শৃঙ্খলার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনি সব সময় যা খেতেন সেটা থেকে কিছুটা কাট-ছাঁট করুন। সকালের রুটি, পরাটা থেকে ১টা কম খাবেন, দুপুরের ভাত থেকে $^1/_2$ প্লেট কম। একইভাবে রাতেও একটু কাট-ছাঁট করে খান। ১ দিন ২ দিন নয় ব্যাপারটাকে সব সময়ের জন্য সঙ্গী করে নিন। এতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কোন কারণ নেই। ডায়েটিং-এর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষের যে অসুবিধা দেখা দেয় তা হলো; নির্দিষ্ট সময়ের আহার বন্ধ করে দেয়া বা খাদ্য তালিকার সম্পূর্ণ পরিবর্তন যেমন কোন এক বেলা হয়ত খান না অথবা ভাতের ক্ষেত্রে রুটি ইত্যাদি আর তাতে তিনি তার অভ্যাসটি শৃঙ্খলার সাথে ধরে রাখতে পারেন না। আপনাকে মনে রাখতে হবে, হুট করে সিদ্ধান্ত পাল্টালে চলবে না। দুপুরের ১ মুঠো ভাত বা সকালে একটি পরাটা কম গ্রহণ করে ও অনেক ক্যালরি হ্রাস করা সম্ভব। আর ক্যালরি হ্রাস হলেই আপনার বাড়তি মেদ, কোলেস্টরেল ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছেন। এ ব্যাপারে সহায়তার জন্য কিছু টিপ্‌স দেয়া হলো- ডায়েটিং-এর শুরুতে আপনি যা করতে পারেন ঃ

১। খাবারে বাড়তি লবণ খাবেন না। এতে খাবার একটু বিষাদ লাগবে এ কারণে আপনি এমনিতেই কম খাবেন।

২। আপনি খাওয়ার সময় চামচে খান। অল্পক্ষণেই খাওয়াতে পরিশ্রম লাগবে।

৩। খাওয়ার সময় যে কোন কিছু সামনে নিয়ে পড়তে থাকুন। অন্য দিকে নেশা চলে যাবে।

৪। ছোট ছোট আকারে আহার মুখে তুলুন।

৫। অপেক্ষাকৃত ছোট প্লেটে খাবার খান এতে খাবার স্বল্প পরিমাণ থাকলেও প্লেট ভরাট মনে হবে কিন্তু আহার হবে পরিমাণ মত।

৬। অবসর সময় ঘুমিয়ে না কাটিয়ে বাজার করুন, ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করুন অন্ততঃ ১ ঘন্টা কায়িক পরিশ্রম করুন তাতে ক্যালরি ক্ষয় হতে সাহায্য করবে।

৭। সপ্তাহে অন্ততঃ ১ বার আপনার ওজন মাপুন। আপনার ওজন যদি কমে তবে আপনার মন প্রফুল্ল হবে। ইচ্ছা-শক্তির সাফল্যের চাইতে বড় কোনো সাফল্য আর হতে পারে না।

৮। খাওয়ার আগে এক মুঠো মুড়ি বা শুকনা একটি টোষ্ট খেয়ে পানি খেয়ে নিতে পারেন তাতে খাওয়ার নেশাটি কমে যাবে।

৯। খাওয়ার টেবিলে নিজেকে খুব দায়িত্বশীল করে তুলুন। সকলের জন্য রেখে খেতে হবে -এ মনোভাবটা সমুন্নত রাখুন।

১০। খাওয়ার টেবিলে নিজের লোভ সংবরণ করুন এবং আদর্শ বা মডেল হিসেবে ভাবুন।

যেমন মনে করুন আপনি ৫ পাউন্ড ওজন সাফল্যের সাথে কমানোর পর আপনি নিজেকে পুরস্কৃত করার জন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠান বা অন্য কোন বিনোদনের ব্যবস্থা করলেন। বন্ধু-বান্ধবকে ঘটনাটি জানালেন। এ পদ্ধতি ব্যবহারে আপনিও উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং অন্যরাও এথেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন। অভ্যাসটি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিলেন। আর এ সাফল্য মানে তো কেবল ওজন কমানো নয়। আপনি সুস্থ ও সাবলীল থাকার জন্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পরিমিত আহার গ্রহণ করছেন মেদহীন ও সুস্থ থাকছেন। আর এটা বিজ্ঞানসম্মত ও প্রমাণিত সত্য যে, মোটা লোকের চেয়ে স্লিম লোকেরাই বাঁচে বেশি। আর দীর্ঘায়ু মানেই তো যে কোন আনন্দকে বেশি করে উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া, এটি অতিরিক্ত পাওয়া নিশ্চয়ই। আর কবির ভাষায়- মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই॥

- ডাঃ পারভীন হাকিম

নিউজিল্যান্ড জামাতে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ১৩ই মার্চ ২০০৩, অকল্যান্ড বেলা দু' ঘটিকায় অকল্যান্ডে অবস্থিত নিউজিল্যান্ড আহমদীয়া মুসলিম জামাতের 'বায়তুল মুকীত' মসজিদে বাদ যুহর জনাব সলিম হাজারী (বাংলাদেশী) কর্তৃক সূরা জুমুআ তেলাওয়াতের মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। বক্তাগণ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর প্রাক্ দাবীর জীবনী আলোচনা করেন। শেষ পর্বে কানাডা জামাত কর্তৃক কুখ্যাত আলেকজান্ডার ডুই-এর জীবনের উপর নির্মিত এমটিএ ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়।

সম্মেলন শেষে ভ্রাতা জাফরুল্লাহ্ খানের পরিবারবর্গের বদান্যতায় নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ৫০ জনের মত আনসার, খোদ্দাম, আতফাল এবং প্রায় সমসংখ্যক লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নিউজিল্যান্ড জামাতের নতুন কেন্দ্র

নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে অবস্থিত আহমদীদের ক্রয়কৃত নতুন জমি এটি। এখানে পূর্ব থেকেই ছবিতে দৃশ্যমান গৃহগুলো অবস্থিত ছিল। বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাগত বাঙ্গালী আহমদীদের সক্রিয় উদ্যোগে ২০০০ সনে গৃহসহ এ কেন্দ্রটি ক্রয় করা হয়। এ কেন্দ্রের একটি গৃহে নিয়মিত প্রতিদিন আযান দিয়ে ওয়াক্তি নামায, প্রতি শুক্রবার জুমুআর নামায সহ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে আস্‌ছে। এছাড়া জামাতি সকল কার্যক্রম বর্তমানে এ কেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হচ্ছে। এখানে MTA -এর সংযোগ আছে। এ কেন্দ্র চালু হওয়ার পূর্বে নিউজিল্যান্ড (অকল্যান্ড) জামাতের সদস্যরা ক্লাব ঘর / কমিউনিটি সেন্টার অথবা কোন হল ঘর ভাড়া নিয়ে প্রতি শুক্রবার জুমুআর নামায এবং জামাতি অন্যান্য সকল কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছিল। বাংলাদেশী আহমদী সদস্য ও লাজনাদের দাবী ছিল, আমরা হল ঘর বা ক্লাব ভাড়া নিয়ে নামায পড়ব না। অকল্যান্ড জামাতের নিজস্ব জমিতে আঞ্জুমান ও মসজিদ হওয়া অতি জরুরী। পরবর্তীতে সকলের জোর প্রচেষ্টা, দোয়া ও মালি কুরবানীর বদৌলতে সর্বোপরি আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে নিউজিল্যান্ডের প্রাণ কেন্দ্র অকল্যান্ডের এ সুন্দর মনোরম কেন্দ্র স্থাপিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। এখানকার সকল সদস্য-সদস্যার জন্য আহ্‌মদী ভাই-বোনদের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত জানাচ্ছি।

- শরীফ আহমদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নিউজিল্যান্ড

ক্রোড়া মজলিসের ওয়াকারে আমল

ক্রোড়া জামাতের নির্মাণাধীন মোয়াল্লেম কোয়ার্টারের জন্য সম্প্রতি দু'টি ওয়াকারে আমল করা হয়েছে। ১২/৪/০৩ তারিখে ১২ জন খাদেম ও ৩ জন ত্রিফল ৪ হাজার ইট কোয়ার্টার নির্মাণ স্থানে নিয়ে ষ্টেক দিয়ে ওয়াকারে আমল করেছে।

এবং ১৫/০৪/০৩ তারিখে কোয়ার্টারে ৩ জন খাদেম ও ২ জন তিফল পানি ঢেলে ওয়াকারে আমল করেছে। এ দু'টি ওয়াকারে আমলে জামাতের প্রায় ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

- মোঃ হারুন অর রশিদ কাজল
মোতামাদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ক্রোড়া

বগুড়ায় ৫ম বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফে নও (রাজশাহী রিজিওন-২) তা'লীম তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন ২০০৩

আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে ৫দিন ব্যাপী ৫ম বার্ষিক বিভাগীয় ওয়াকফে নও (রাজশাহী রিজিওন-২) তা'লীম-তরবিয়তি ক্লাস ও সম্মেলন/২০০৩ গত ১৪/৪/০৩ হতে ১৮/৪/০৩ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত,বগুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহীর দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জামাত থেকে ২২ জন ওয়াকফে নও, ১৫ জন মাতা এবং ১২ জন পিতা ক্লাসে যোগদান করেন। ১৪/০৪/০৩ সকাল ১০ ঘটিকায় বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও অধ্যাপক রাজীবউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে ওয়াকফে নও আমাতুল হাফিয ফ্রেনসী (বগুড়া) নযম পাঠ করে ওয়াকফে নও নাসিরুল ইসলাম (তাহেরাবাদ) স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব খোন্দকার আজমল হক। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি বিভাগীয় সেক্রেটারী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম এস, এম আব্দুল হক। অনুষ্ঠান সূচী মোতাবেক বেলা ১১ টায় যথারীতি তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাস শুরু হয়। এরপর প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। মাঝে দুপুরে গোসল, খাবার, নামায-যুহর-আসর জমা এবং বিশ্রাম; সন্ধ্যায় মাগরিব ও ইশা নামায জমা করা হয়। বিকালে চা পান ও খেলাধূলার জন্য বিরতি দেয়া

১ম জেলা তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাস এবং ২য় জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ রহমতে ১ম জেলা তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাস এবং ২য় জেলা ইজতেমা, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম জেলার অধীনে বিগত ২১শে এপ্রিল হতে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত মসজিদ বায়তুল বাসেত, চট্টগ্রাম-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২১শে এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিল রোজ সোমবার তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ১ম জেলা তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাস শুরু হয়। বাদ ফজর কুরআন ক্লাস করেন দেহাতী মোয়াল্লেম আনোয়ার আহমদ। নামায শিক্ষা ও উর্দূ ক্লাস পরিচালনা করেন দেহাতী মোয়াল্লেম আনোয়ার আহমদ এবং জনাব আবদুল ওয়াহেদ। দুপুরে খোদ্দামদের সিলসিলার কিতাব ইসলামী নীতি দর্শন এবং আতফালদের জন্যে আমাদের শিক্ষা -এর উপর ক্লাস নেন জনাব মনজুর আহমদ খান, সেক্রেটারী তা'লীম ও তরবিয়ত, দেহাতী মোয়াল্লেম আনোয়ার হোসেন। বাদ মাগরিব বক্তৃতার বিভিন্ন বিষয়ের উপর খোদ্দামের ক্লাস নেন আমীর সাহেব ও আতফালের ক্লাস নেন জনাব মোজাম্মেল হক। বাদ ইশা বাংলা নযমের উপর ক্লাস নেন জনাব এস. এম. রহমতুল্লাহ্‌। গড়ে ১৪ জন আতফাল এবং ১০ জন খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন।

২২ তারিখ বাদ মাগরিব বক্তৃতার বিভিন্ন বিষয়ের উপর ক্লাস নেন জনাব মোজাম্মেল হক। এরপর আহমদীয়তের ইতিহাসের উপর ক্লাস নেন রিজিওনাল কায়েদ। ২২ তারিখ ক্লাসসমূহে গড়ে ১৬ জন আতফাল এবং ১২ জন খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন।

২৩ তারিখ ক্লাসসমূহে গড়ে ১৬ জন আতফাল এবং ১৬ জন খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন।

২৪শে এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার সকালে আহমদীয়তের ইতিহাস এবং সিলসিলার কিতাব ইসলামী নীতি দর্শন-এর উপর ক্লাস নেন রিজিওনাল কায়েদ এবং জনাব মনজুর আহমদ খান। ২৪ তারিখ ক্লাসসমূহে গড়ে ১৭ জন আতফাল এবং ১৬ জন খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন।

২৪শে এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০টায় আতফালের ক্রিকেট ম্যাচ শুরুর মাধ্যমে ২য় জেলা ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। বিকালে আতফালদের স্মৃতিশক্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর খোদ্দামদের ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং বাদ ইশা লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। রাত ১০.০০ টায় খোদ্দামদের ধীর গতির সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫শে এপ্রিল রোজ শুক্রবার সকাল ৭.০০ হতে খোদ্দাম ও আতফালদের গুলাইল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ৮.৩০ হতে কুরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতা এবং ৯.৩০ হতে নযম (উর্দূ ও বাংলা আলাদাভাবে) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৫শে এপ্রিল রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ইজতেমার সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব আবদুস সামাদ, নায়েব সদর-১। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলওয়াত ও নযম পেশ করেন রিয়াজ আহমদ ও মোহাম্মদ শাহেদুজ্জামান। প্রধান অতিথির ভাষণ দেন আমীর সাহেব এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জেলা কায়েদ শাহীন আহমদ। এরপর সভাপতি সাহেব তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। এরপর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। সবশেষে সভাপতি সাহেবের আহাদ পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

সেক্রেটারী
১ম জেলা তা'লীম ও তরবিয়তি ক্লাস
২য় জেলা ইজতেমা ২০০৩ কমিটি

হয়। মোট ৯টি বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাসের বিষয় ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ হচ্ছেন-(১) পবিত্র কুরআন (শেষের ৫টি সূরা শব্দার্থসহ)-শিক্ষক মোয়াল্লেম আমীর হোসেন (২) হাদীস-শিক্ষক মোয়াল্লেম মোজাফ্‌ফর আহমদ (৩) দোয়া শিক্ষা-শিক্ষক মোয়াল্লেম জাহিদুল ইসলাম (৪)আদব-আখলাক-শিক্ষক মোয়াল্লেম নাসের আহমদ আনসারী (৫) কুরআন তাজবীদ- শিক্ষক অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ (৬) উর্দূ শিক্ষা-শিক্ষক জনাবা হাসিনা ফরহাৎ (বগুড়া) (৭) নযম -শিক্ষক এস.এম আব্দুল হক (৮) বক্তৃতা-শিক্ষক খোন্দকার আজমল হক (৯)দীনি মালুমাত-আকাঈদ-শিক্ষক অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ। ১৮/০৪/০৩ তাং ৪দিনের ক্লাসের উপর ভিত্তি করে (১) সিনিয়র, জুনিয়র ও কনিষ্ঠ গ্রুপ ওয়াকফে নও (২) মাতা-পিতাদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিচারক মন্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন মোয়াল্লেমগণ। তাদের দেয়া ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতার প্রতিটি বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অন্যদেরকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেয়া হয়। ১৮/০৪/০৩ বাদ জুমুআ বেলা ৩টায় সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ন্যাশনাল সেক্রেটারী (ওয়াকফে নও) মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে আমাতুল হাফিয ফ্রেনসী এবং নযম পাঠ করে রুহুল আমীন রিয়োন। ওয়াকফে নও শিশু এবং তাদের পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক জ্ঞানগর্ভ সমাপনী ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী। পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেব। অতঃপর ৫ দিন ব্যাপী এ মহতী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

- অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ
রাজশাহী বিভাগীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220,-8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dnaka-1217
Phone : 414550, 9331306

বিভিন্ন জামাত পরিদর্শনে মোহতরাম ন্যাশনাল আমীর ও তাঁর সফরসঙ্গীবৃন্দ

আহমদনগর জামাতের দারুল হাশেম হালকায়

দারুল হাশেম হালকার শিশুদের মাঝে চকলেট বিতরণ

বি.বাড়িয়া জামাতে

জগদল জামাতে শিশু-কিশোরদের সাথে

জগদল জামাতে

বিরগঞ্জ জামাতে

ভাতগাঁও জামাতে

শ্যামপুর জামাতে : বক্তব্য রাখছেন ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ

New Vo. No. 65 ◆21th Issue May 15, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

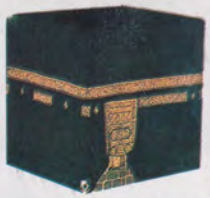

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি শুক্রবার জুমুআর খুতবার কিছুক্ষণ পর হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান এবং প্রতি মঙ্গলবার সকালে পুনঃপ্রচার।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com